হীরের পাহাড়

অনিল ভৌমিক



হীরের পাহাড়

অনিল ভৌমিক



HIRER PAHAR Rs. 8/-
by ANIL BHOWMIK.

Published by—
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3, College Street Market.
Calcutta. 700007 (Ist floor)

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ, ১৯৭৯
মে, ১৯৭৯

সপ্তম মুদ্রণ
আশ্বিন, ১৩৯৩
অক্টোবর, ১৯৮৬

প্রতিষ্ঠাতা :
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকা :
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
সি-৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতলে)
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রাকর :
তাপস সাঁতরা
সন্তোষী প্রিন্টার্স
৪৩ বি, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :
নারায়ণ দেবনাথ

পরিকল্পনা :
দিব্যদ্যুতি পাল

আট টাকা

সোনার বাবি (শান্তনু ভৌমিক),
সোনার মন্তা (নন্দিনী ভৌমিক),
তোমাদের দিলাম।
বাবা

নিবেদন

বর্তমান উপন্যাসের কিছু অংশ রচনায় একটি বিদেশী চিত্র-কাহিনীর সাহায্য নিয়েছি। তাও হুবহু অনুসরণ করিনি। সেটুকু সাজিয়েছি নিজের চিন্তাভাবনা অনুযায়ী।

"হীরের পাহাড়ে"র পূর্ববর্তী অধ্যায় "সোনার ঘন্টা"। তবে কাহিনী হিসেবে দুটোই ভিন্ন। যেটুকু যোগ আছে, সেটুকু বর্তমান উপন্যাসের প্রথম প্রদত্ত 'কাহিনী সূত্র' পাঠ করলেই জানা যাবে।

এই উপন্যাস প্রকাশকালে যার কথা আমার সবচেয়ে বেশী মনে পড়ছে, তিনি হলেন "শুকতারা" পত্রিকার পরলোকগত কর্ণধার ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার। শুধু উৎসাহই নয়, তাঁর পত্রিকায় ধারাবাহিক লেখবার সুযোগও তিনি করে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে আমার অশেষ ঋণ।

'শুকতারায়' ধারাবাহিকভাবে বেরুবার সময় অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা পত্রযোগে লেখাটা বই আকারে প্রকাশ করতে অনুরোধ করেছিলেন।

মে, ১৯৭৯

অনিল ভৌমিক

।। কাহিনী সূত্র ।।

ভাইকিংদের রাজার মন্ত্রীর ছেলে ফ্রান্সিস। ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছে ডাকাত পাদ্রীদের তৈরী সোনার ঘণ্টার গল্প। দিনে তারা পাদ্রীর কাজকর্ম করত। রাত হলেই শুধু ডাকাতের পোষাক পরে ঘোড়ায় চড়ে বেরুতো সোনা ডাকাতি করতে। এইভাবেই একটা বিরাট সোনার ঘণ্টা তৈরী করে ভূমধ্যসাগরের এক নির্জন দ্বীপে ওরা সেই সোনার ঘণ্টা রেখে এসেছিল। ফেরার পথে জাহাজডুবি হয়। মাত্র একজন ডাকাত পাদ্রী বেঁচে ছিল। সে দু'টো মোহরে কুঁদে রেখেছিল সেই সোনার ঘণ্টার দ্বীপে যাওয়া ও ফিরে আসার নক্সা।

বড় হ'য়ে এই সোনার ঘণ্টার সন্ধানে বেরুলো ফ্রান্সিস। কুয়াশা-ঝড় আর ডুবো-পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ওদের জাহাজ ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। কোনরকমে প্রাণ বাঁচল ফ্রান্সিসের। ভাসতে-ভাসতে আমদাদ নগরের কাছে এক মরুভূমিতে গিয়ে উঠল। সেখানে মরু-দস্যুদের দলে পরিচয় হল ফজলের সঙ্গে। মরুদস্যুদের দল থেকে পালিয়ে আমদাদ নগরে এল। সঙ্গে সুলতানী মুদ্রা নেই। কী করে? ফজল ওর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় দু'টো মোহর দিয়েছিল। তারই একটা বিক্রী করে দিয়ে খেতে গেল এক সরাইখানায়। সেখানে মকবুলের সঙ্গে পরিচিত হয়েই শুনল হীরের পাহাড়ের গল্প।

এদিকে আমদাদ নগরের সুলতান ফ্রান্সিসের কাছ থেকে জানতে চাইলেন সোনার ঘণ্টার হদিশ। না বললে ফ্রান্সিসকে অন্ধ করে দেওয়া হবে। অথচ ফ্রান্সিস শুধু সোনার ঘণ্টার বাজনাই শুনেছে, চোখে দেখে নি। কিন্তু সুলতান সে কথা বিশ্বাস করলেন না। বন্ধু ফজলের বুদ্ধিতে সুলতানের কারাগার থেকে পালিয়ে দেশে ফিরে গেল।

কিন্তু ফ্রান্সিসের জীবনের স্বপ্ন সোনার ঘণ্টা সে খুঁজে বের করবেই। পঞ্চাশজন সাহসী বন্ধু নিয়ে সে আবার এলো সোনার ঘণ্টার খোঁজে। আবার কুয়াশা-ঝড়ের পাল্লায় পড়ে ডুবো পাহাড়ের ধাক্কা খেয়েও জাহাজটা বেঁচে গেল। আবার এলো আমদাদ নগরে। সুলতান সবাইকে বন্দী করলেন। ফ্রান্সিসের ফাঁসির আদেশ হ'ল। এবারও বন্ধু ফজলের সাহায্য ফ্রান্সিস বেঁচে গেল। ইতিমধ্যে ফ্রান্সিস জেনেছে সেই মোহর দু'টোয় আঁকা নক্সার কথা। কিন্তু তার একটা যে বিক্রী করে দিয়েছে, অন্যটা মকবুল চুরি করেছে। ফজলের কাছে পাওয়া গেল সেই মোহর দু'টো যে কাগজে জড়ানো ছিল, অস্পষ্ট নক্সাটাও তারই হদিশ বুঝে নিয়ে সে সুলতানকে নিয়ে গেল সেই সোনার ঘণ্টার দ্বীপে।

সোনার ঘণ্টা নিয়ে সুলতান আমদাদ নগরে ফিরে এলেন। তিনি যে কথা দিয়েছিলেন সোনার ঘণ্টা পেলে সব ভাইকিংদের মুক্তি দেবেন, সে কথা তিনি রাখলেন না। বন্দী অবস্থায় ফ্রান্সিসদের আমদাদ নগরে নিয়ে আসা হল। এদিকে ভাইকিংদের রাজা ও মন্ত্রী ফ্রান্সিসদের খুঁজতে খুঁজতে আমদাদ নগরে এসেছেন। তারা সুলতানের সৈন্যদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে আমদাদ দখল করে নিয়েছেন, এ সংবাদ সুলতান জানতেন না। সুলতানের সঙ্গে ভাইকিংদের যুদ্ধে সুলতান হেরে গেলেন। সেই সময় রাস্তা দিয়ে সোনার ঘণ্টাটা আনা হচ্ছিল। গাড়ীর চাকা ভেঙে গড়িয়ে গিয়ে পড়ল ফ্রান্সিসের সঙ্গে যুদ্ধরত সুলতানের গায়ে। পিষ্ঠ হয়ে সুলতান মারা গেলেন। আমদাদের নতুন সুলতান হ'ল ফজল।

ইতিমধ্যে মকবুলের সঙ্গে ফ্রান্সিসের দেখা হয়েছে। ফ্রান্সিস মকবুলকে সঙ্গে নিয়ে দেশের দিকে চলল। আসলে সে মকবুলের কাছে শোনা হীরের পাহাড়ে যাবার জন্যেই মকবুলকে সঙ্গে নিল। শুরু হ'ল ফ্রান্সিসের 'হীরের পাহাড়' অভিযানের কাহিনী।

ফজল সুলতান হল। আমদাদ নগর জুড়ে খাওয়া-দাওয়া, হৈ-হল্লা চলল সাতদিন ধরে। ভাইকিংদের রাজা, মন্ত্রী, ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুরা সকলেই আনন্দ-উৎসবে যোগ দিল।

সাতদিন পরে আনন্দ-উৎসব শেষ হল। এবার ঘরে ফেরার পালা। আমদাদ বন্দরে ভাইকিং-রাজার তিনটে জাহাজ তৈরী হল। জাহাজগুলোর কিছু মেরামতির কাজ ছিল, তাও শেষ হল। যে কাঠের পাঠাতনে সোনার ঘণ্টাটা রাখা হয়েছে, সেটা একটা জাহাজের পেছনে কাছি দিয়ে বাঁধা হল। রাজা, মন্ত্রী, ফ্রান্সিস, তার বন্ধুরা, আর সব সৈন্যরা সবাই জাহাজে উঠল। ফ্রান্সিস ফজলকে অনুরোধ করল, মকবুলকে যেন তার সঙ্গে যেতে দেওয়া হয়। ফজলের আপত্তি থাকার কোন কারণ নেই, কিন্তু মুশকিল হল ভাইকিংদের রাজাকে নিয়ে। তিনি বিদেশী বিধর্মী মকবুলকে নিজের দেশে নিয়ে যেতে রাজি হলেন না। ফ্রান্সিস রাজামশাইকে বোঝাল—মকবুল মানুষ হিসেবে খুবই ভাল। তার দায়িত্ব ফ্রান্সিস নিজেই নিল। রাজা আর আপত্তি করলেন না। ফ্রান্সিস তাদের নৌকোটা একটা জাহাজের সঙ্গে বেঁধে নিল। এই নৌকোটাতে করেই বিরাট লম্বা কাছি নিয়ে ফ্রান্সিসরা কুয়াশা-ঝড় আর ডুবো পাহাড়ের বিপদ পার হয়ে সোনার ঘণ্টা আনতে পেরেছিল। সবাই ঐ নৌকোটার কথা ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু ফ্রান্সিস তা ভোলে নি। নৌকোটাকে বরাবর নিজেদের জাহাজের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। আসল কথা, ফ্রান্সিস আবার পালাবার ফিকির খুঁজছিল। নৌকোটা থাকলে জাহাজ থেকে পালানো সহজ হবে। ফ্রান্সিসের এই পালানোর ফন্দীর কথা কেউ জানত না, জানত শুধু ফ্রান্সিসের বন্ধু হ্যারি। নৌকো করে জাহাজ থেকে পালিয়ে আফ্রিকায় নামা যাবে।

—তা যাবে। কিন্তু সেই পাহাড়টাতে যেভাবে ধ্বস নেমেছিল, তারপর এখন যে ওটার কী অবস্থা হয়েছে—

—পাহাড়ের অবস্থা যাই হোক, হীরেটা তো আর পালাবে না?

—হুঁ, কিন্তু আমাদের তো প্রথমে ওঙ্গালির বাজারে যেতে হবে। অনেকটা পথ।

—তাই যাব আমরা।

—বেশ আমার কোন আপত্তি নেই।

—মকবুল, তুমি হবে গাইড। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

—বেশ।

ফ্রান্সিস বলল—মকবুল সমস্ত ঘটনাটা আর একবার বলো তো।

—কোন্ ঘটনা?

—সেই হীরের পাহাড়ের সন্ধান তুমি কীভাবে পেয়েছিলে। কী ঘটেছিল সেখানে।

—কেন? তোমাকে তো সব ঘটনাই বলেছিলাম।

—আবার শুনতে চাইছি। ঘটনাটা আবার শুনলে বুঝতে পারব, ওখানে যে হীরেটা ছিল, সেটার কী হল।

—বেশ, শোন; বলে মকবুল বলতে আরম্ভ করল—আমি কার্পেট বিক্রীর ধান্দায় গিয়েছিলাম ওঙ্গালিতে। জায়গাটাতে তেকরুর বন্দর থেকে যেতে হয়। আমি ঘোড়ায়

টানা গাড়ীতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ গাড়ীর চাকাটা রাস্তায় পাথরের সঙ্গে লেগে গেল ভেঙে। কাছেই এক কামারের কাছে সারাতে দিলাম। কামারটার নাম বুঙ্গা। ওই আমাকে প্রথম সেই অদ্ভুত গল্পটা শোনাল। ওঙ্গালি থেকে মাইল পনেরো উত্তরে একটা পাহাড়। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। পাহাড়টার মাঝা-মাঝি জায়গায় রয়েছে একটা গুহা। দূর থেকে গাছ-গাছালি ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গুহাটার সমান্তরালে এসে সূর্যের আলো সরাসরি গিয়ে গুহাটায় পড়ে। তখনই দেখা যায় গুহার মুখে আর তার চারপাশের গাছের পাতায়, ডালে-ঝোপে এক অদ্ভুত আলোর খেলা। আয়না থেকে যেমন সূর্যের আলো ঠিকরে আসে, তেমনি রামধনুর রঙের মত বিচিত্র সব রঙীন আলো ঠিকরে আসে গুহাটা থেকে। অনেকেই দেখেছে এই আলোর খেলা। ধ'রে নিয়েছে ভূতুড়ে কাণ্ড কারখানা। ভূত-প্রেতকে ওরা যমের চেয়েও বেশী ভয় করে। কাজেই কেউ এই রঙের খেলার কারণ জানতে ওদিকে পা বাড়াতে সাহস করে নি।

—আচ্ছা, এই আলোর খেলা সারাদিন দেখা যেত? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—উহুঁ, সূর্যের আলোটা যতক্ষণ সরাসরি সেই গুহাটায় গিয়ে পড়ছে, ততক্ষণই শুধু। তারপর আবার যে-কে সেই।

—সেই কামার বুঙ্গা সে-কি এর কারণ জানতে পেরেছিল?

—না, ও গুহাটায় গিয়ে দেখে নি—তবে অনুমান করেছিল। বুঙ্গা বলেছিল—ঐ আলো হীরে থেকে ঠিকরানো আলো না হ'য়েই যায় না। ও নাকি প্রথম জীবনে কিছুদিন এক জহুরীর দোকানে কাজ করেছিল। হীরের গায়ে আলো পড়লে সেই আলো কীভাবে ঠিকরোয়, এই ব্যাপারটা ওর জানা ছিল। আমি তো বুঙ্গার কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম।

—কেন?

—ভেবে দেখ ফ্রান্সিস—অত আলো—মানে, আমি তো পরে সেই আলো আর রঙের খেলা দেখেছিলাম—মানে, ভেবে দেখ—হীরেটা কত বড় হলে অত আলো ঠিকরোয়।

—তারপর?

—তারপর একদিন দড়ি-গাঁইতি এসব নিয়ে পাহাড়টার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। যে করেই হোক, সেই গুহার মধ্যে ঢুকতে হবে। কিন্তু সেই পাহাড়টার কাছে পেঁ ছে আক্কেল গুড়ুম হ'য়ে গেল। নীচ থেকে গুহা পর্যন্ত পাহাড়টা খাড়া উঠে গেছে। কিছু ঝোপ-ঝাড়, দু'একটা জঙ্গলী গাছ, আর লম্বা-লম্বা বুনো ঘাস ছাড়া খাড়া পাহাড়ের গায়ে আর কিছুই নেই। নিরেট পাথুরে খাড়া গা। কামার ব্যাটা বেশ ভেবেচিন্তেই এসেছে বুঝলাম। ও বলল—চলুন আমরা পাহাড়ের ওপর থেকে নামবো। ভেবে দেখলাম সেটা সম্ভব। কারণ পাহাড়টার মাথা থেকে শুরু করে গুহার মুখ অবধি আর তার আশে-পাশে বেশ ঘন জঙ্গল। দড়ি ধ'রে নামা যাবে। একটু থেমে মকবুল বলতে লাগল—সন্ধ্যের আগেই পাহাড়ের মাথায় উঠে বসে রইলাম। ভোরবেলা নামার উদ্যোগ আয়োজন শুরু করলাম। পাহাড়টার মাথায় একটা মস্ত বড় পাথরে দড়ির একটা মুখ বাঁধলাম। তারপর দড়ির অন্য মুখটা ঝুলিয়ে দিলাম। দড়ির মুখটা গুহার মুখ পর্যন্ত পেঁছিল কিনা, বুঝলাম না। কপাল ঠুকে দড়ি ধরে ঝুলে পড়লাম। দড়ির শেষ মুখে পেঁছে

দেখি, গুহাটা তখনও অনেকটা নীচে। সেখান থেকে বাকি পথটা গাছের ডাল, গুঁড়ি, লতাগাছ এসব ধরে-ধরে শ্যাওলা-ধরা পাথরের ওপর দিয়ে সন্তর্পণে পা রেখে একসময় গুহাটার মুখে এসে দাঁড়ালাম। বুঙ্গাও কিছুক্ষণের মধ্যে নেমে এল। ও যে বুদ্ধিমান, সেটা বুঝলাম ওর এক কাণ্ড দেখে। বুঙ্গা দড়ির মুখটাতে আরও দড়ি বেঁধে নিয়ে পুরোটাই দড়ি ধরে এসেছে। পরিশ্রমও কম হয়েছে ওর।

—তারপর? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—দু'জনেই গুহাটায় ঢুকলাম। একটা নিস্তেজ মেটে আলো পড়েছে গুহাটার মধ্যে। সেই আলোয় দেখলাম, কয়েকটা বড়-বড় পাথরের চাঁই—তারপরেই একটা খাদ থেকে উঠে আছে একটা ঢিবি। ঠিক পাথুরে ঢিবি নয়। অমসৃণ এবড়োখেবড়া গা—অনেকটা জমাট আলকাতারার মত। হাত দিয়ে দেখলাম, বেশ শক্ত। সেই সামান্য আলোয় ঢিবিটার যে কি রঙ, ঠিক বুঝলাম না। তবে দেখলাম ওটা নীচে অনেকটা পর্যন্ত রয়েছে, যেন কেউ পুঁতে রেখে দিয়েছে। বুঙ্গা এতক্ষণ গুহার মুখের কাছে এখানে-ওখানে ছড়ানো-ছিটানো বড়-বড় পাথরগুলোর ওপর একটা ছুঁচোলো-মুখ হাতুড়ির ঘা দিয়ে ভাঙা টুকরোগুলো মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখছিল। তারপর হতাশ হয়ে ফেলে দিচ্ছিল। আমি বুঙ্গাকে ডাকলাম—বুঙ্গা দেখতো এটা কিসের ঢিবি? বুঙ্গা কাছে এল। এক নজরে ঐ এবড়ো-খেবড়ো ঢিবিটার দিকে তাকিয়েই বিস্ময়ে ওর চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। ওর মুখে কথা নেই। ঠিক তখনই সূর্যের আলোটা সরাসরি গুহাটার মধ্যে এসে পড়ল। আমরা ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। সেই এবড়ো-খেবড়ো ঢিবিটায় যেন আগুন লেগে গেল। জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড যেন। সে কি তীব্র আলোর বিচ্ছুরণ! সমস্ত গুহাটায় তীব্র চোখ ঝলসানো আলোর বন্যা নামল যেন। ভয়ে-বিস্ময়ে আমি চীৎকার করে উঠলাম—বুঙ্গা শীগ্‌গির চোখ ঢাকা দিয়ে বসে পড়—নইলে অন্ধ হয়ে যাবে।

দু'জনেই চোখ ঢাকা দিয়ে বসে পড়লাম। কতক্ষণ ধরে সেই তীব্র, তীক্ষ্ণ চোখ-অন্ধ-করা আলোর বন্যা বয়ে চলল, জানি না। হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল। ভয়ে-ভয়ে চোখ খুললাম। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চারদিকে। অসীম নৈঃশব্দ। হঠাৎ সেই নৈঃশব্দ ভেঙে দিল বুঙ্গার ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্না। অবাক কাণ্ড! ও কাঁদছে কেন? অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে বুঙ্গার কাছে এলাম। এবার ওর কথাগুলো স্পষ্ট শুনলাম। ও দেশীয় ভাষায় বলছে—অত বড় হীরে—আমার সব দুঃখকষ্ট দূর হয়ে যাবে—আমি কত বড়লোক হয়ে যাব। বুঝলাম, প্রচণ্ড আনন্দে, চূড়ান্ত উত্তেজনায় ও কাঁদতে শুরু করেছে। অনেক কষ্টে ওকে ঠাণ্ডা করলাম। আস্তে-আস্তে অন্ধকারটা চোখে সয়ে এল। বুঙ্গাকে বললাম—এসো, আগে কিছু খেয়ে নেয়া যাক।

কিন্তু কা'কে বলা! বুঙ্গা তখন ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গেছে। হঠাৎ ও উঠে গেল ঢিবিটার দিকে। হাতের ছুঁচলো হাতুড়িটা দিয়ে আঘাত করতে লাগল ওটার গায়ে। টুকরো-টুকরো হীরে চারিদিকে ছিট্‌কে পড়তে লাগল। হাতুড়ির ঘা বন্ধ করে বুঙ্গা হীরের টুকরোগুলো পকেটে পুরতে লাগল। তারপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল হাতুড়িটা নিয়ে। আবার হীরের টুকরো ছিটকোতে লাগল। আমি কয়েকবার বাধা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু উত্তেজনায় ও তখন পাগল হয়ে গেছে।

—তারপর? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

একবার বুঙ্গা করল এক কাণ্ড ! গুহার মধ্যে পড়ে থাকা একটা বড় পাথর তুলে নিল। তারপর দু'হাতে পাথরটা ধরে হীরেটার ওপর ঘা মারতে লাগল, যদি একটা বড় টুকরো ভেঙে আসে। কিন্তু হীরে ভাঙা কি অত সোজা ? সে কথা কা'কে বোঝাব তখন ? ও পাগলের মত পাথরে ঘা মেরেই চলল। ঠক্—ঠক্ পাথরের ঘায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল গুহাটায়। হঠাৎ—

—কী হল ?

—সমস্ত পাহাড়টা যেন দুলে উঠল। গুহার ভেতরে শুনলাম, গম্ভীর গুড়গুড় শব্দ। শব্দটা কিছুক্ষণ চলল। তারপর হঠাৎ একটা কানে তালা লাগানো শব্দ। শব্দটা এল পাহাড়ের মাথার দিক থেকে। বিরাট-বিরাট পাথরের চাঁই ভেঙে পড়ছে। বুঝলাম, যে কোন কারণেই হোক পাহাড়ের মধ্যে কোন একটা পাথরের স্তর নাড়া পেয়েছে, তাই এই বিপত্তি। এখন আর ভাববার সময় নেই, গুহা ছেড়ে পালাতে হবে, অবলম্বন একমাত্র সেই দড়িটা। ছুটে গিয়ে দড়িটা ধরলাম। টান দিতেই দেখি, ওটা আলগা হয়ে গেছে। বুঝলাম, যে পাথরের চাঁইয়ে ওটা বেঁধে এসেছিলাম সেটা নড়ে গেছে। এখন দড়িটা কোন ঝোপে বা গাছের ডালে আটকে আছে। একটু জোরে টান দিলাম। যা ভেবেছি তাই। দড়ির মুখটা ঝুপ্ করে নীচের দিকে পড়ে গেল। এক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে খোদাতাল্লাকে ধন্যবাদ জানালাম। কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছিল না। পায়ের নীচের মাটি দুলতে শুরু করেছে। ভালোভাবে দাঁড়াতে পারছি না। টলে পড়ে যাচ্ছিলাম। তাড়াতাড়ি দড়ির মুখটা একটা বড় পাথরের সঙ্গে বেঁধে ফেললাম। এখন দড়ি ধরে নামতে হবে। কিন্তু বুঙ্গা ? ও কি সত্যিই পাগল হয়ে গেল। এত কাণ্ড ঘটছে, বুঙ্গার কোনো হুঁশও নেই। ও পাথরটা ঠুকেই চলেছে। ছুটে গিয়ে ওর দু'হাত চেপে ধরলাম—বুঙ্গা শীগগির চল্—নইলে মরবি।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। এক ঝটকায় ও আমাকে সরিয়ে দিল। আবার ওকে থামাতে গেলাম। এবার ও হাতের পাথরটা নামিয়ে ছুঁচলো-মুখ হাতুড়িটা বাগিয়ে ধরল। বুঝলাম, ওকে বেশী টানাটানি করলে ও আমাকেই মেরে বসবে। ওকে আর বাঁচানোর চেষ্টা করে লাভ নেই।

আবার একটু থেমে মকবুল বলতে লাগল—

—গুহার মধ্যে তখন পাথরের টুকরো, ধুলো ঝুরঝুর করে পড়তে শুরু করেছে। আর দেরী করলে আমিও জ্যান্ত কবর হয়ে যাবো। পাগলের মত ছুটলাম গুহার মুখের দিকে। তারপর গুহার মুখে এসে দড়িটা ধরে কীভাবে নেমে এসেছিলাম, আজও জানি না। পর-পর পাঁচদিন ধরে শুধু বুনো ফল আর ঝর্ণার জল খেয়ে হাঁটতে লাগলাম। গভীর জঙ্গলে কতবার পথ হারালাম। বুনো জন্তু-জানোয়ারের পাল্লায় পড়লাম। তারপর যেদিন ওঙ্গালির বাজারে এসে হাজির হলাম, সেদিন আমার চেহারা দেখে অনেকেই ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিল।

মকবুলের গল্প শেষ হলে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারী করতে লাগল। এক-সময় সে জিজ্ঞেস করল—ওঙ্গালির বাজারে যেতে হলে আমাদের কোন্ বন্দরে নামতে হবে ?

—তেকরুর বন্দরে নামতে হবে।

—এই জাহাজগুলো কি সেই বন্দর হয়ে যাবে।

—না। তেকরুর বন্দর পশ্চিম আফ্রিকায়।

ফ্রান্সিস এবার হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—হ্যারি, একটু বুদ্ধি-টুদ্ধি দাও।

হ্যারি হাসল—তোমার বুদ্ধি আমার চেয়ে কিছু কম নয়।

—তবু তুমি কিছু বল।

—কী আর বলব! আমাদের ছোট নৌকোটায় করে জাহাজ থেকে পালাতে হবে।

—কখন? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—আর দু-তিন দিনের মধ্যেই জাহাজটা উত্তর আফ্রিকার ধার ঘেঁসে যাবে। তখন নৌকোটায় উঠে পালিয়ে গিয়ে উত্তর আফ্রিকায় নামব আমরা।

—তারপর?

—সেখান থেকে তেকরুরগামী জাহাজে করে আমরা তেকরুর যাব।

—বেশ। ফ্রান্সিস আবার পায়চারী করতে লাগল। তারপর থেমে বলল—তাহ'লে পরশু রাতে ঠিক এ সময় মকবুল এখানে আসবে। তারপর পালাব।

মকবুল চলে গেল। হ্যারিও বিছানায় শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরেই ওর নাক ডাকতে শুরু করল। কিন্তু ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। শুয়ে-শুয়ে ফ্রান্সিস হিসেব করতে লাগল—কতটা খাবার-দাবার, খাওয়ার জল, আর কী-কী নিতে হবে।

*   *   *

পরের দিন। ফ্রান্সিস ডেক-এ পায়চারি করছিল। তখনই দেখা ভাইকিংদের রাজার সঙ্গে। রাজা হেসে ডাকলেন—ফ্রান্সিস?

—আজ্ঞে বলুন।

—হীরের পাহাড়ের ভূত মাথা থেকে নামল?

ফ্রান্সিস নিরীহ ভঙ্গিতে বলল—ওসব ভেবে আর কী করব? আপনি তো একটা জাহাজ দিলেন না।

—ওসব ভাবনা ছাড়। এখন সোজা বাড়িতে।

—বেশ।

রাজামশাই চলে গেলেন। ফ্রান্সিস আবার নিজের ভাবনায় মগ্ন হল। দু'দিন মাত্র হাতে। এর মধ্যে ফ্রান্সিস অনেক খাবার-দাবার একটা প্যাকিং বাক্সে পুরল। একটা বড় কুঁজো ভরতি খাবার জল, দড়ি, আর দু'টো তরোয়াল সব নিজেদের কেবিন ঘরে জমা করল।

তিন দিনের দিন গভীর রাতে মকবুল এল। অনেক রাত হয়েছে তখন। ধরাধরি করে তিনজনে মিলে খাবারের বাক্সটাকে জাহাজের ডেক-এ তুলল। তারপর ওটাকে নিয়ে এল জাহাজের হালের কাছে। আকাশে চাঁদের আলো। ফ্রান্সিস দেখল, ওদের নৌকোটা ঢেউয়ের দোলায় দুলছে। হালের সঙ্গে কাছি দিয়ে বাঁধা। ফ্রান্সিস কাছিটা টেনে নৌকোটাকে কাছে নিয়ে এল। তারপর খাবারের বাক্সটা দড়ি দিয়ে বেঁধে আস্তে-আস্তে নৌকোটার মাঝখানে নামিয়ে দিল। এবার ফ্রান্সিস দড়ি ধরে ঝুলতে-ঝুলতে নৌকার ওপর নেমে এল। তারপরেই নেমে এল হ্যারি। মকবুল জলের কুঁজোটা দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিল।

ফ্রান্সিস কুঁজোটা ধরে নৌকায় নামিয়ে নিল। এবার মকবুল দড়ি ধরে নেমে এল। সবাই তৈরী হল এবার। ফ্রান্সিস কোমরে গোঁজা তরোয়ালটা খুলে জাহাজের সঙ্গে বাঁধা নৌকার কাছিটা কেটে ফেলল। নৌকোটা একবার পাক খেয়ে ঘুরে অনেকটা সরে এল। জাহাজটা আস্তে-আস্তে দূরে সরে যেতে লাগল। চাঁদের আলোয় বেশ কিছুক্ষণ জাহাজটাকে দেখা গেল। তারপর আর দেখা গেল না। জাহাজ থেকে ওরা তখন অনেক দূরে চলে এসেছে। চারদিকে শুধু জল আর জল। জলে ছোট-ছোট ঢেউ। চাঁদের আলো পড়ে চিকচিক করছে। হ্যারি আর মকবুল গায়ে কম্বল জড়িয়ে নৌকোর পাঠাতনে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। সে নৌকো বাইতে লাগল। ফ্রান্সিস আমদাদ বন্দরে নৌকোটার মেরামতি করিয়েছিল। তখন একটা কাঠের মাস্তুলও লাগিয়ে নিয়েছিল পাল খাটাবার জন্যে। হাওয়ার জোর নেই তেমন। কাজেই ফ্রান্সিস পাল খাটায় নি। বৈঠা দিয়ে নৌকো বাইতে লাগল। সারা রাত ফ্রান্সিস নৌকো বইতে লাগল। ভোরের দিকে জোর হাওয়া ছুটল। ফ্রান্সিস হাওয়ার দিকটা অনুমান করল। ঠিকই আছে। হাওয়া দক্ষিণমুখো বইছে। ফ্রান্সিস পাল খাটাল। হাওয়ার তোড়ে পাল ফুলে উঠলো। নৌকো তরতর জল কেটে ছুটল। ফ্রান্সিস পালের দড়ি-দড়া হালের সঙ্গে বেঁধে হ্যারির পাশে এসে শুয়ে পড়ল। পূর্বদিকে তাকিয়ে দেখলো আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। মাথার ওপর আকাশটা তখনও কালো। তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে। আস্তে-আস্তে আকাশের অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। সূর্য উঠতে বেশী দেরী নেই। উত্তর আফ্রিকার কোথায় নৌকো ঠেকবে, সেখান থেকে তেকরুর বন্দরেই বা কী করে যাওয়া যাবে, এসব ভাবতে-ভাবতে ফ্রান্সিস একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।



তিন দিনের দিন গভীর রাতে মকবুল এল।

হ্যারির ধাক্কায় ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। চোখ কচলাতে-কচলাতে ফ্রান্সিস উঠে বসল। দেখল বেশ বেলা হয়েছে। রোদের তেজও বাড়ছে। হ্যারি ডাকল—সকালের খাবার খেয়ে নাও। ফ্রান্সিস সমুদ্রের জলে হাত-মুখ ধুয়ে নিল। তারপর খেতে বসল।

হ্যারি বলল—কাল সারারাত বোধহয় ঘুমোও নি।

ফ্রান্সিস হাসল। হ্যারি বললো—হাসির কথা নয় ফ্রান্সিস। এভাবে রাত জাগতে শুরু করলে ওঙ্গালির বাজারে আর ইহজন্মে পৌঁছতে পারবে না।

—কিন্তু আফ্রিকার উপকূলে যেখানে হোক, আমাদের পৌঁছুতে হবে।

—তাই বলে রাত জেগে নৌকা বাইতে হবে? হ্যারি অবাক চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

ফ্রান্সিস হেসে বললে—কতদিনের খাদ্য আর জল আমাদের সঙ্গে আছে জানো?

—না।

—মাত্র চার দিনের। এই চার দিনের মধ্যে আমাদের মাটিতে পেঁছোতে হবে।

—চারদিন যথেষ্ট সময়। এর মধ্যে আমরা ঠিক পেঁছে যাব।

—অত নিশ্চিন্ত থাকা ভাল নয় হ্যারি। ফ্রান্সিস বলল। সে দেখল, পাল গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। নৌকো একজায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। হ্যারিকে জিজ্ঞেস করল—পাল গুটিয়ে ফেললে কেন?

—দেখছো না, হাওয়া পড়ে গেছে।

—তাহ'লে বৈঠা বাইতে হবে।

—আমরা বাইছি। তুমি শুয়ে বিশ্রাম কর, পারো একটু ঘুমিয়ে নাও।

—বেশ। ফ্রান্সিস কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল।

ফ্রান্সিস নৌকোর পাঠাতনে শুয়ে পড়ল। প্রচণ্ড রোদ। হাত দিয়ে চোখ ঢাকা দিল। বেশ ঝির-ঝিরে হাওয়া দিচ্ছে, জলে বৈঠা চালাবার শব্দ উঠছে—ছপ্ ছপ্। হ্যারি আর মকবুল কথা বলছে। সমুদ্রে বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ফ্রান্সিস কাত হয়ে শুলো। রাত জাগা চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে ফ্রান্সিস ধড়মড় করে উঠে বসল। দেখল, বেশ বেলা হয়েছে। মকবুল বৈঠা বাইছে। হ্যারি খাবার-দাবার প্লেটে সাজাচ্ছে।

খেতে-খেতে ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি, নিশানা ভুল হয় নি তো?

– কী করে বলি, তবে দক্ষিণদিক নিশানা করেই তো নৌকা চালাচ্ছি।

—দেখা যাক।

বেলা পড়ে এল। পশ্চিমদিক লাল হয়ে উঠল। আস্তে-আস্তে সূর্য অস্ত গেল। চারদিক অন্ধকার করে রাত্রি নামল। রাত্রিরে খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস বৈঠা নিয়ে বসল। আজকেও হয়ত সারারাত বৈঠা বাইতে হবে। হাওয়ার জোর বাড়ে নি এখনও। হ্যারি আর মকবুল পাঠাতনে শুয়ে পড়ল। বেশ কয়েকঘণ্টা কেটে গেল। আস্তে-আস্তে হাওয়ার জোর বাড়তে লাগল। কপাল ভাল—হাওয়াটা দক্ষিণমুখো। ফ্রান্সিস পাল বেঁধে দিল। হাওয়ার জোরে পাল ফুলে উঠল। নৌকো চলল দ্রুতগতিতে। কেমন শীত-শীত করছে। ফ্রান্সিস কম্বল জড়িয়ে পাঠাতনের একপাশে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম আসতে চায় না। নানা চিন্তা মাথায়। তেকরুর বন্দরে কী করে পেঁছানো যাবে। সেখান থেকে ওঙ্গালির বাজারে। তেকরুর বন্দরে পেঁছতে পারলে ওঙ্গালির বাজারে যাওয়ার একটা হিল্লে হয়ে যাবে। কিন্তু মাটির তো দেখা নেই। আগে তো আফ্রিকার উপকূলে পেঁছোতে হবে, তারপর তো তেকরুর যাওয়া। হঠাৎ মা'র কথা মনে পড়ল। বাবার কথা। ওর এইভাবে জাহাজ থেকে পালিয়ে যাওয়ায় বাবা নিশ্চয় ভাল চোখে দেখবেন না। তারায় ভরা কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

এক সময় ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। তিনদিন কেটে গেল। নৌকো চলছে তো চলে-ছেই। মাটির কোন চিহ্নমাত্র নজরে পড়ছে না। চিন্তায় ওদের মুখ শুকিয়ে গেল। তাহ'লে কি দিক ভুল হয়ে গেল? নৌকোয় যা খাবার-দাবার মজুত আছে টেনেটুনে আর

দুটো দিন চলতে পারে। তারপর ? খাদ্য নেই জল নেই। দিনে রোদের প্রচণ্ড তেজ। রাত্রে ঠাণ্ডা। উপোসী শরীরে আর কতদূর যেতে পারবে ওরা ? কতক্ষণই বা নৌকো বাইতে পারবে ?

চার দিন কেটে গেল। পাঁচ দিনের দিন রাত্রে অবশিষ্ট খাদ্য আর জল ওরা খেল না। একেবারে উপোস করে রইল। পরের দিনটা তো চালানো যাবে। পরের দিন গেল আধ-পেটা খেয়ে। তারপরের দিন একেবারে উপোস। এক ফোঁটা জল নেই। খাদ্যও না। উপোসী শরীর নেতিয়ে পড়ে। বৈঠা বাইবার শক্তি নেই। পাল বেঁধে দিল। নৌকা যেদিকে খুশী চলল। ওরা নির্জীবের মত পাঠাতনে শুয়ে রইল। সূর্য যেন আগুন বর্ষণ করে সারাদিন। ওরা দিনের বেলা জামা খুলে রাখে, শুধু রাত্রে জামা গায়ে দেয়। ওদের গা পোড়া তামার মত হয়ে গেছে। তৃষ্ণায় বুক পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। কিন্তু এক-ফোঁটা খাবার জল নেই। তৃষ্ণার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে মকবুল সমুদ্রের জলই খেয়ে নিল। কিন্তু খালি পেটে ঐ নোনতা জল—পেটে পাক দিয়ে বমি উঠে আসে। শরীর আরো অবসন্ন করে দেয়।

হঠাৎ আকাশের কোণায় কালো মেঘ দেখা দিল। দেখতে-দেখতে আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। একটু পরেই প্রচণ্ড বৃষ্টি নামল। ওরা আনন্দে নাচতে লাগল। মুখ হাঁ করে বৃষ্টির জল খেতে লাগল। ওরা বৃষ্টির জলে জামা ভিজিয়ে নিতে লাগল। তারপর সেটাই চিপে-চিপে কুঁজোয় জল ভরতে লাগল। একটু পরেই বৃষ্টি থেমে গেল। ততক্ষণে কুঁজোতে অনেকটা জল ভরা হয়ে গেছে। জলের সমস্যা যা হোক মিটল। কিন্তু খাদ্য ? ফ্রান্সিস কোন সমস্যার সামনেই চুপ করে বসে থাকার মানুষ নয়। সে ভাবতে লাগল—কী করে খাবার জোগাড় করা যায়। পেয়েও গেল একটা উপায়। মাছ ধরতে হবে। অমনি পাঠাতনের নীচে থেকে পেরেক হাতুড়ি বের করল। দড়ি তো ছিলই। একটা লম্বা পেরেক হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে-ঠুকে বঁড়শীর মত বানাল। তারপর খাবারের বাক্সটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজে রুটির কয়েকটা টুকরো আর গুঁড়ো পেল। সেগুলোই জল দিয়ে মেখে টোপ তৈরী করল। তারপর দড়ির ডগায় পেরেকের বড়শী বাঁধল। বড়শীর ডগায় টোপ লাগিয়ে সমুদ্রের জলে ফেলে বসে রইল।

ঠিক তখনই ওর হঠাৎ নজরে পড়ল তিন-চারটে হাঙর ঠিক নৌকোর পেছনে-পেছনে আসছে। মৃত্যুদূত ? ফ্রান্সিসের অন্যমনস্ক মনটা নাড়া পেল। তবে কি ঐ সাংঘাতিক প্রাণীগুলো ওদের আসন্ন মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এসেছে ? ফ্রান্সিস মকবুলের দিকে তাকাল। দেখল, মকবুল অসাড় হয়ে আছে।

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। এই বিপদের কথা তো ওদের জানাতে হয়। হ্যারি ফ্রান্সিসের মুখ দেখেই ব্যাপারটা অনুমান করল। বিষন্ন হাসি হেসে বলল—ফ্রান্সিস, আমি জানি তুমি জলে কী দেখছ।

—হ্যারি, তুমি কি আগেই এগুলো দেখেছ ?

—হ্যাঁ, পরশু বিকেল থেকে ওরা আমাদের পিছু ধাওয়া করছে।

—কই, আমাকে তো বল নি ?

—মকবুল পাছে জানতে পারে, তাই বলি নি।



ফ্রান্সিস বঁড়শীটা জলে ফেলে চুপ করে বসে রইল।

কথাটা বোধ হয় মকবুলের কানে গেল। সে পাশ ফিরে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে দুর্বলস্বরে জিজ্ঞেস করল— কী হয়েছে?

— কিছু না, তুমি ঘুমোও।

মকবুল আর কোন কথা না বলে ক্লান্তিতে চোখ বুঁজলো। ফ্রান্সিস বুঝল, কেন হ্যারি হাঙরগুলোর কথা তাকে বলেনি। মকবুল এমনিতেই প্রচণ্ড রোদে উপবাসে জলকষ্টে নেতিয়ে পড়েছে। হাঙরের কথা জানতে পারলে, সে আরো দুর্বল হয়ে পড়বে। মনোবল একেবারে হারিয়ে ফেলবে। কাজেই মকবুলকে কিছুতেই হাঙরগুলোর কথা বলা হবে না। ফ্রান্সিস বঁড়শী জলে ফেলে চুপ করে বসে রইল। মাঝে-মাঝে তাকিয়ে হাঙরগুলোকে দেখতে লাগল। ওর মন সংকল্প আরো দৃঢ় হল। যে করেই হোক বাঁচতেই হবে। অনাহারক্লিষ্ট শরীর। বেশীক্ষণ এক ঠাঁয় বসে থাকতে কষ্ট হয়। শিরদাঁড়াটা টনটন করতে থাকে। তবু ফ্রান্সিস দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল। খাদ্য চাই, বাঁচতেই হবে আমাদের। মাথায় শুধু এক চিন্তা—বাঁচতেই হবে।

হঠাৎ দড়িটায় টান লাগল। ফ্রান্সিস দড়িটায় হ্যাঁচকা টান মেরে ঝাঁকিয়ে দেখলে—বেশ ভারী কিছু আটকেছে বঁড়শীটায়। ফ্রান্সিস আনন্দে লাফিয়ে উঠল। হ্যারিও উঠে দাঁড়াল—কী ব্যাপার?

ফ্রান্সিস ডাকল—হ্যারি শীগ্‌গির এসো, একটা মাছ পাকড়েছি।

হ্যারিও এক লাফে ওর কাছে এল। দু'জনে মিলে দড়ি ধরে টানতে লাগল। একটু পরেই মাছটাকে টেনে নৌকোর ওপর তুলল। বড় আকারের একটা সামুদ্রিক মাছ। দু'জনের আনন্দ দেখে কে? যা হোক দু'তিন দিনের খাবার জুটল। হ্যারি তার কোমরে গোঁজা ছুরিটা ফ্রান্সিসকে দিল। সে ছুরিটা দিয়ে মাছটা কাটতে লাগল। একটু কাটা হলে দু-তিনটে টুকরো বের করে নিল। হ্যারিকেও এক টুকরো দিল। মহা আনন্দে দু'জনে কাঁচা মাছই চিবিয়ে খেতে লাগল। একটু পরে মকবুলকে ডাকল। তাকেও কয়েক টুকরো মাছ দিল। মকবুল ক্ষিদের জ্বালায় তাই খেতে লাগল। কয়েকদিন উপবাসের পর কাঁচা মাছ ভালোই লাগল। ক্ষিদের জ্বালায় অনেকটা মাছই খেয়ে ফেলল ওরা। বাকীটুকু পাঠাতনের নীচে রেখে দিল, পরের দিনের জন্যে।

দিন যায়, রাত যায়, ডাঙার দেখা নেই। শুধু জল আর জল। আধ খাওয়া মাছটা শেষ হলে ফ্রান্সিস আবার চেষ্টা করলো মাছ ধরবার জন্যে। কিন্তু ওর পেরেক-বঁড়শীতে আর মাছ ধরা পড়ল না। সুতরাং একটানা উপবাস চলল কয়েকদিন। শরীরে যেন আর একফোঁটাও শক্তি নেই। অসাড় শরীর নিয়ে তিনজনে নৌকার পাঠাতনে শুয়ে থাকে। ফ্রান্সিস মাঝে-মাঝে মাথা উঁচু করে চারিদিকে একবার তাকিয়ে নেয়—যদি মাটির দেখা মেলে। হাঙরগুলোকে দেখে আর ভাবে, বাঁচবার কোন আশা নেই। খাদ্য নেই, বৃষ্টির পরে রাখা জলও শেষ। এবার আস্তে-আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হবে।

সেদিন বিকেলের দিকে হঠাৎ ফ্রান্সিসের নজরে পড়ল দূরে জাহাজের পাল। ফ্রান্সিস দ্রুতপায়ে উঠে দাড়াল। শরীর দুর্বল! পা দু'টো কাঁপছে। তবু ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। হ্যাঁ—জাহাজই। কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক দূরে। তবু একবার শেষ চেষ্টা করতে হবে! বৈঠার সঙ্গে গায়ের জামাটা বেঁধে নাড়তে

লাগল। যদি জাহাজের লোকদের নজরে পড়ে। কিন্তু, না জাহাজ এদিকে ফিরল না যেমন যাচ্ছিল, তেমনি যেতে লাগল।

ততক্ষণে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে সংকেত জানাবার আর কোন উপায় নেই। একমাত্র উপায় জাহাজটার দিকে লক্ষ্য করে নৌকাটা চালানো। যদি কোনরকমে জাহাজটার সঙ্গে দূরত্বটা কমানো যায়। শরীর টলছে। হাঁটু দুটো কাঁপছে। কিন্তু এই শেষ চেষ্টা। নইলে মৃত্যু অবধারিত। হঠাৎ মনে পড়ল হাঙরগুলোর কথা। ফ্রান্সিস জলের দিকে তাকাল। হাঙরের দল মাঝে-মাঝে জল থেকে লেজ তুলে ঝাপটা দিচ্ছে। বোধহয় সংখ্যায় আরো বেড়েছে ওরা। ফ্রান্সিস আর চুপ করে শুয়ে থাকতে পারলে না। শরীরের সমস্ত জোর একত্র করে বসল, বৈঠাটা হাতে নিল। তারপর প্রাণ-পণে নৌকো বাইতে লাগল জাহাজটাকে লক্ষ্য করে।

সারারাত ধরে নৌকো বাইল ফ্রান্সিস। ক্লান্তিতে-অবসাদে শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে। চোখ বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু ফ্রান্সিস হার মানে নি। ঐ অবস্থাতেই নৌকো বেয়েছে।

সূর্য উঠল। ভোর হল। ভাল করে তাকাতেও কষ্ট হচ্ছে। তবু তাকাতে হবে—দেখতে হবে জাহাজটা কত দূরে। হঠাৎ দেখল একটা পাতলা কুয়াশার মত আস্তরণের পিছনেই বিরাট জাহাজের পাল। আনন্দে ফ্রান্সিস চীৎকার করে উঠতে গেল। কিন্তু পারল না। গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না। ফ্রান্সিস নিজের শরীরটাকে পাঠাতনের ওপর দিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। হ্যারির কাছে এনে হ্যারিকে ধাক্কা দিল। হ্যারি আস্তে-আস্তে তাকাল ওর দিকে। ফ্রান্সিস অবসাদগ্রস্ত ডান হাতখানা তুলে জাহাজের দিকে ইঙ্গিত করল। তারপর ওর চোখের সামনে সব কিছু মুছে গেল। শুধু শোনা গেল, হ্যারি চীৎকার করে কী বলছে। সেই চীৎকারের শব্দটাও দূরবর্তী হতে-হতে এক সময় মিলিয়ে গেল। সব অন্ধকার। কোনও শব্দই আর ওর কানে পেঁছোল না। ফ্রান্সিসের অবসন্ন দেহটা জ্ঞান-হারিয়ে পাঠাতনের উপর গড়িয়ে পড়ল।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে ফ্রান্সিস যখন তাকাল, দেখল, ও একটা কেবিনঘরে শুয়ে আছে। দাড়িওলা একজন বুড়োমত লোক ওর নাড়ী টিপে দেখছে। ফ্রান্সিস বুঝল, ইনি ডাক্তার। ফ্রান্সিসকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে ডাক্তার হাসলেন। বললেন—কী? কেমন লাগছে?

—শরীরটা দুর্বল। ফ্রান্সিস টেনে-টেনে বলল।

—সব ঠিক হয়ে যাবে। এবার একটু খেয়ে নাও। একেবারে বেশী করে খেতে দেওয়া হবে না। কম-কম করে খাবে।

ফ্রান্সিসের মনে হল, ক্ষুধাতৃষ্ণার বোধটুকুও যেন আর নেই ওর।

—ক'দিন উপোস করে ছিলে? ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

—চার-পাঁচদিন হবে।

—হুঁ—দু'তিন দিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

হঠাৎ ফ্রান্সিসের মনে পড়ল হ্যারি আর মকবুলের কথা। ফ্রান্সিস ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠতে গেল। ডাক্তার হাঁ-হাঁ করে উঠলেন।

—বিছানা ছেড়ে এখন ওঠা চলবে না।

—কিন্তু আমার সঙ্গে যারা ছিল আমার বন্ধুরা—তারা কোথায় ?

—পাশের কেবিনেই আছে—

—আমি ওদের দেখতে চাই।

—উঁহু, আজকে নয়, কালকে।

—কিন্তু—

—কোন কথা নয়—শুধু বিশ্রাম এখন।

একটু পরেই একজন লোক মাংসের ঝোল আর রুটি নিয়ে ঢুকল।

ডাক্তার বললেন—নাও, খেয়ে নাও।

ফ্রান্সিস খেতে বসল। এতদিনের উপবাস অথচ খেতে ইচ্ছে করছে না। আসলে উপবাসে-উপবাসে ওর খিদেই মরে গিয়েছিল। যতটা ভাল লাগল খেল। খাওয়ার-দাওয়ার পর শরীরে যেন একটু বল পেল। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বলল—অনেক ধন্যবাদ।

—আমাকে নয়—জাহাজের ক্যাপ্টেনকে। এক্ষুনি আসবেন।

একজন লোক কেবিনঘরে ঢুকল। মুখে ছুঁচোলো গোঁফ-দাড়ি। ক্যাপ্টেনের পোশাক পরে। ফ্রান্সিস বুঝল—ইনিই ক্যাপ্টেন।

ক্যাপ্টেন ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল—এখন কেমন আছে ?

—ভালো। জ্ঞান ফিরেছে, তবে শরীরের দুর্বলতা কাটতে কয়েক দিন যাবে।

—হুঁ। এবার ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল—কেমন আছেন ?

ফ্রান্সিস মাথা কাত করে জানালে —ভালো।

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করল—নৌকো করে কোথায় যাচ্ছিলেন ?

ফ্রান্সিস সাবধান হল। হীরের পাহাড়ের কথা বললেই বিপদ বাড়বে তো কমবে না। কাজেই অন্য ছুতো দেখাতে হল। বলল—আমাদের জাহাজ জলদস্যুরা আক্রমণ করেছিল। অনেক কষ্টে আমরা তিনজন জাহাজ থেকে নৌকা করে পালাতে পেরেছিলাম।



একটু পড়েই একজন লোক মাংসের ঝোল আর রুটি নিয়ে ঢুকল।

ক্যাপ্টেন আর কোন কথা জিজ্ঞেস করল না। ফ্রান্সিসও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাবার সময় ক্যাপ্টেন বলল—কয়েকদিন বিশ্রাম নিন, খাওয়া-দাওয়া করুন, শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

পরের দিনটিও ফ্রান্সিস কেবিন ঘরে বিছানায় শুয়েই কাটালো। সন্ধ্যে নাগাদ হ্যারি আর মকবুল এল। হ্যারি খুশীতে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। মকবুলও খুশী। বলল—ফ্রান্সিস, তোমার জন্যেই এ যাত্রায় আমরা বেঁচে গেলাম।

হ্যারি জিজ্ঞেস করল—ফ্রান্সিস, তুমি কি শরীরের ঐ অবস্থায় সত্যিই সারারাত নৌকো বেয়েছিলে ?

—উপায় কি ? নইলে এই জাহাজটার কাছে পেঁছানো যেত না।

তিনজনে মিলে কিছুক্ষণ গল্পগুজব চলল। গল্প বেশির ভাগই ওরা কী করে উদ্ধার পেল, তাই নিয়ে হল। কী করে অচৈতন্য ফ্রান্সিসকে জাহাজে তোলা হল, ওরাই বা দড়ি ধরে কী ভাবে জাহাজে উঠল—এসব নিয়ে কথাবার্তা হল। ফ্রান্সিস একসময় জিজ্ঞেস করল—তোমরা খোঁজ নিয়েছো, জাহাজটা কোথায় যাচ্ছে ?

—হ্যাঁ। আমি খোঁজ নিয়েছি—মকবুল বলল—জাহাজটা পর্তুগীজদের। ওদের একটা বন্দর আছে পশ্চিম আফ্রিকার নিম্বাতে। সেই বন্দরেই যাচ্ছে জাহাজটা।

—ফ্রান্সিস বললে—তাহ'লে তেকরুর বন্দরে যাবার উপায় ?

—নিম্বা থেকেই আর একটা জাহাজ ধরে তেকরুর যেতে হবে—

মকবুল বলল— আর এই জাহাজ দু' একদিনের মধ্যেই নিম্বা পেঁছুবে।

আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে হ্যারি আর মকবুল চলে গেল। ফ্রান্সিস চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। শরীরের দুর্বলতা এখনো কাটেনি। বেশ ক্লান্ত লাগছে শরীরটা। তবু ফ্রান্সিসের চিন্তার যেন শেষ নেই। কী করে তেকরুর বন্দরে পেঁছুবে। সেখান থেকে কী করে ওঙ্গালির বাজারে যাওয়া যাবে। এসব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে ফ্রান্সিস আবার একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

দু'দিন পরে জাহাজটা নিম্বা বন্দরে ঢুকলো। ছোট বন্দর। জনবসতি খুবই কম। কিন্তু উপায় নেই। এই বন্দরেই অপেক্ষা করতে হবে অন্য জাহাজের জন্য। ফ্রান্সিসরা জাহাজ থেকে নামবার আগে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করতে গেল। ক্যাপ্টেনকে বারবার ধন্যবাদ জানাল। ক্যাপ্টেনই ওদের হদিশ দিল একটা সরাইখানার। একজন পর্তুগীজ সরাইখানাটা চালায়। ফ্রান্সিসরা জাহাজ থেকে নেমে সেই সরাইখানাটা খুঁজে বের করল। খুবই সস্তা সরাইখানা। খাওয়ার টেবিল, বাসনপত্র নোংরা। তা হোক—এই সরাইখানা এখন স্বর্গ ওদের কাছে। কতদিন অপেক্ষা করতে হয়, কে জানে ? একটা বড়ো দেখে ঘর ওরা ভাড়া নিল। ঘরটার জানালা থেকে সমুদ্র আর নিম্বা বন্দর স্পষ্ট দেখা যায়। কোন নতুন জাহাজ এলে ওদের চোখে পড়বেই।

আগের জাহাজের ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিসদের একটা মোহরের ভাঙানি দিয়ে গিয়েছিল পর্তুগীজ মুদ্রায়। মুদ্রাগুলো খুব কাজে লেগে গেল। ফ্রান্সিস খাওয়া থাকার জন্যে দু'দিনের আগাম পাওনা সরাইখানাকে মিটিয়ে দিল। সরাইওলা তাতেই বেজাই খুশী। দু'বেলা ওদের খোঁজপত্তর করতে লাগল। স্নানের জল, আলো আর ভাল খাবার-দাবারের সুবন্দোবস্ত করে দিল। জাহাজের খালাসীদের হাঁকে-ডাকে নিম্বা বন্দরটা মুখরিত হয়ে রইল এ ক'দিন। কিন্তু জাহাজটা চলে যেতেই আবার নিঃসাড় হয়ে গেল নিম্বা বন্দর।

নিম্বা বন্দরের একপাশে সমুদ্র। তা ছাড়া সবদিকেই ঘন জঙ্গল। শুধু জঙ্গল ছাড়া দেখবার কিছুই নেই। ফ্রান্সিসরা দুটো দিন নিজেদের ঘরেই শুয়ে বসে কাটিয়ে দিল।

তিন দিনের দিন দুপুর নাগাদ একটা মস্ত বড় জাহাজের পাল দেখা গেল সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায়। জানলা থেকেই দেখা গেল জাহাজটা। তিনজনেই ছুটে বেরিয়ে এল সরাই-

খানা থেকে। জাহাজঘাটায় গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল জাহাজটার জন্যে। এক সময় জাহাজটা ঘাটে এসে লাগল। ফ্রান্সিসের আর তর সইল না। পাঠাতন ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে জাহাজে গিয়ে উঠল। মকবুল আর হ্যারি জাহাজঘাটায় দাঁড়িয়ে রইল। নতুন জাহাজের ক্যাপ্টেন বেশ দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ। দু'চার মিনিট কথাবার্তা চলতেই ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিসদের সঙ্গে পুরনো বন্ধুর মত ব্যবহার করতে লাগল। কথায়-কথায় ক্যাপ্টেন জানাল—পানীয় জলের ঘাটতি পড়েছে বলেই এই বন্দরে জাহাজ ভেড়াতে হয়েছে। কাল-কেই আবার জাহাজ সমুদ্রে ভাসবে। তেকরুর বন্দরে মাত্র একবেলার জন্য নোঙর করবে। তারপর আরো কয়েকটা বন্দরে থেমে-থেমে পর্তুগাল যাত্রা করবে।

ফ্রান্সিস খুব খুশী হল। তেকরুর বন্দরে যাওয়ার একটা উপায় হলো। জাহাজ থেকে নেমেই বন্ধুদের এই খবরটা দেবার জন্যে ছুটলো।

সন্ধ্যের সময় কম্বল-টম্বল যা ছিল, তাই নিয়ে ফ্রান্সিসরা জাহাজে এসে উঠল। তেকরুর বন্দরে যাওয়া যাবে, এই উত্তেজনায় ফ্রান্সিসের সারারাত ভালো করে ঘুম হলো না। শুধু তেকরুর বন্দরে পৌঁছুনোই নয়, তারপরেও আছে ওঙ্গালির বাজারে যাওয়া। সেখান থেকে হীরের পাহাড়ে যাওয়া। এইসব ভাবনাচিন্তায় রাত কেটে গেল।

ফ্রান্সিস কেবিন-ঘর থেকে বেরিয়ে ডেক-এ এসে দাঁড়াল। পূর্ব আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। একটু পরে সূর্য উঠল। নিম্বা বন্দরের জঙ্গলের মাথা আলোয় আলোময় হয়ে উঠল। অন্ধকার কেটে গিয়ে সূর্যের আলোয় চারদিক ঝলমল করতে লাগল। ঘড়-ঘড় শব্দে নোঙর তোলা হল। সাড়া পড়ে গেল জাহাজের দাঁড়ি আর লোকজনের মধ্যে। ভালো করে পাল বাঁধা হল। ভোরের হাওয়ায় পালগুলো ফুলে উঠল। জাহাজ চললো তেকরুর বন্দরের উদ্দেশ্যে।

দু'দিন পরে জাহাজটা তেকরুর বন্দরে পৌঁছল। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এখানে-ওখানে দু'চারটে আলো টিমটিম করে জ্বলছে। অন্ধকারেও ফ্রান্সিস যতটা আন্দাজ করতে পারল, তাতে বুঝল, তেকরুর বন্দর নিম্বার চেয়ে বড়। জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে জানতে পারল যে, এই তেকরুর বন্দর থেকে হাতির দাঁতের চালান যায় ইউরোপে। তাই এই বন্দরটা হাতির দাঁতের ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র। ব্যবসার খাতিরে লোকজনের বাস আছে এখানে। সরাইখানাও আছে।

পরের দিন সকালে ফ্রান্সিসরা জাহাজ থেকে নেমে এল। একটা মাথা গোঁজার আস্তানা খুঁজতে হয়। এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতেই একটা সরাইখানার খোঁজ পেল। এখান-কার অধিবাসী প্রায় সবাই এদেশীয় নিগ্রো। কালো পাথরে কোঁকড়া চুল, থ্যাবড়া ঠোঁট। সরাইখানার মালিক কিন্তু আরবীয়। ব্যবসার ধান্ধায় এখানে এসে সরাইখানা খুলে বসেছে। সে বেশ সাদরেই ওদের গ্রহণ করল। থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিল।

দিনকয়েক কাটলো নিশ্চিন্ত বিশ্রামে। এই ক'দিন কতরকম জাহাজ ভিড়ল তেকরুর বন্দরে। কত দেশের লোক যে নামল, তার ঠিক নেই। এর মধ্যেই ঘটলো এক কাণ্ড।

সেদিন দুপুরে ফ্রান্সিসরা খাওয়া-দাওয়া করছে। খাওয়ার ঘরে বেশী লোকজন নেই। এমন সময় দু'জন লোক ঢুকল সরাইখানায়। খাওয়ার ঘরে এসে খাবারের টেবিলে বসল। দু'জনেরই পরনে আরবীয় পোশাক। একজনের একটা চোখের ওপর কালো ফিতে দিয়ে বাঁধা

কালো কাপড়ের টুকরো। এক চোখ অন্ধ লোকটার। সেই লোকটাই মোটা গলায় ডাক দিল খাবার দিয়ে যাওয়ার জন্যে। ফ্রান্সিস এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি যে, মকবুল খাওয়া ছেড়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। ফ্রান্সিস মকবুলের দিকে তাকিয়ে আরো আশ্চর্য হলো। মকবুলের মুখটা ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। ও কোনো কথা বলতে পারছে না।

ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—কি হয়েছে মকবুল ?

কাঁপা-কাঁপা গলার মকবুল বলল—ঐ লোকটাকে দেখেছো তো ?

—কার কথা বলছো ?

—ঐ যে একচোখ কানা লোকটা ?

—হ্যাঁ দেখছি। তাতে কী হয়েছে ?

—লোকটা এক নম্বরের শয়তান। পরে সব বলবো। আমাকে এখন একটু আড়াল করে বসো।

ফ্রান্সিস ওকে আড়াল দিয়ে বসল। মকবুল ভালো করে খেতে পর্যন্ত পারছে না। ফ্রান্সিস আড়াল করে বসা সত্ত্বেও মকবুল কানা লোকটার দৃষ্টির সামনে নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারলে না। সাংঘাতিক দৃষ্টি লোকটার। লোকটা তরোয়ালে হাত রাখল। তারপর টেবিল ছেড়ে উঠে আস্তে-আস্তে এগিয়ে এল ফ্রান্সিসদের দিকে। মকবুল ভয়ে অস্ফুট চীৎকার করে উঠল। ফ্রান্সিস বুঝল, লোকটার মতলব ভালো নয়। যে কারণেই হোক মকবুলকে সহজে ছাড়বে না লোকটা। ফ্রান্সিস ফিসফিস করে হ্যারিকে ডাকল—হ্যারি।

—উঁ।

—ঘর থেকে আমার তরোয়ালটা নিয়ে এসো তো।

হ্যারি এক মুহূর্তও দেরী করল না। ঘরের দিকে ছুটল ফ্রান্সিসের তরোয়ালটা আনতে। কানা লোকটাও ফ্রান্সিসের কাছে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসও টেবিল ছেড়ে উঠে ওর মখোমুখি দাঁড়াল। ঝনাৎ করে শব্দ হলো। লোকটা খাপ থেকে তরোয়াল বের করে ফেলেছে। তরোয়ালের ছুঁচোলো ডগাটা ফ্রান্সিসের বুকে ঠেকিয়ে দাঁতচাপা স্বরে বলল— এই কাফের,তুই সরে যা। ঐ কুত্তাটার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।

ফ্রান্সিস কোন কথা না বলে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লোকটা চেঁচিয়ে বলল—তুই সরে যা।

ফ্রান্সিস বলল—তার আগে আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে।

লোকটা এ রকম উত্তর আশা করেনি। বেশ অবাক হয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর তরোয়ালটা নামিয়ে বলল—তা তোর সঙ্গে বোঝাপড়াটা কি এখানেই হবে না, বাইরে যাবি ?

হ্যারি ঠিক তখনই তরোয়ালটা এনে ফ্রান্সিসের হাতে দিল। তরোয়ালটা হাতে পেয়ে ফ্রান্সিসের মনের জোর অনেকটা বেড়ে গেল। বলল—তোর যেখানে খুশী।

লোকটা এতক্ষণে ফ্রান্সিসের কথাবার্তা শুনে আর ভাবভঙ্গী দেখে বুঝল, এ বড় কঠিন ঠাঁই। তবু এত সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার মানুষও সে নয়। হঠাৎ লোকটা ফ্রান্সিসের মাথা লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। ফ্রান্সিস এই হঠাৎ আক্রমণের জন্যে তৈরীই ছিল।

সে তরোয়াল চালিয়ে মারটা ঠেকাল। শুরু হলো তরোয়ালের লড়াই। কেউ কম যায় না। লোকটা বারবার ফ্রান্সিসকে আঘাত করতে চেষ্টা করে চলল। ফ্রান্সিস শুধু মার ঠেকিয়ে চলল—আক্রমণ করল না। যারা টেবিলে বসে খাচ্ছিল, তারা টেবিল ছেড়ে দেওয়ালের দিকে সরে গেল। তারপর তরোয়াল-যুদ্ধ দেখতে লাগল। হঠাৎ কানা লোকটার একটা মার ফ্রান্সিস ঠিকমত ফেরাতে পারল না। তরোয়ালের ঘায়ে হাতের কাছের জামাটা ফেঁসে গেল! কেটেও গেল। রক্ত পড়তে লাগল। কাণা লোকটা হা-হা করে হেসে উঠল। ফ্রান্সিস মুহূর্ত্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে আক্রমণ করল। লোকটা এরকম দ্রুত আক্রমণ আশা করে নি। ফ্রান্সিসের মার ঠেকাতে-ঠেকাতে পিছিয়ে যেতে-যেতে একটা টেবিলের ওপর গিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস লাফ দিয়ে টেবিলে উঠে পা দিয়ে লোকটার তরোয়ালসুদ্ধ হাতটা টেবিলের ওপর চেপে ধরল। লোকটা কেমন বিমূঢ় দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল—কী, আর বোঝাপড়ার দরকার আছে?



পা দিয়ে লোকটার তরোয়ালশুদ্ধ হাতটা টেবিলের ওপর চেপে ধরল।

লোকটা চোখ-মুখ কুঁচকে তরোয়ালটা মুক্ত করতে চেষ্টা করল। কিন্তু ফ্রান্সিস পা দিয়ে যেভাবে চেপে রেখেছে, তাতে লোকটা হাতের তরোয়াল নাড়াতে পারল না। ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। তারপর জুতোশুদ্ধ পা'টা লোকটার তরোয়াল-ধরা হাতের মুঠোতে জোরে চেপে দিল। লোকটা তরোয়াল ফেলে হাতটা চেপে ধরল। ফ্রান্সিস তরোয়ালটা পা দিয়ে ঠেলে দিল কাণা লোকটার সঙ্গীর দিকে। সঙ্গীটি তরোয়ালটা তুলে নিল। কিন্তু কী করবে বুঝতে না পেরে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল। কানা লোকটা ডান হাতটা চেপে ধরে সঙ্গীটির কাছে এসে দাঁড়াল। সঙ্গীটিকে বেরোবার ইঙ্গিত করে নিজেও দরজার দিকে পা বাড়াল। যাবার সময় মকবুলের দিকে তাকিয়ে বলল—যা, খুব জোর বেঁচে গেলি।

ফ্রান্সিস আবার খেতে বসল। খাওয়া চলছে, তখন ফ্রান্সিস মকবুলকে জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার মকবুল? তোমার ওপর ঐ কানা লোকটার এত রাগ কেন?

মকবুল বলতে লাগল—কী আর বলবো? বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। তখন আমি এই অঞ্চলে কার্পেট বিক্রি করতাম। এই কানা লোকটা হচ্ছে এক দস্যুদলের সর্দার। এই দস্যুদলের কাজই হলো ইউরোপ আমেরিকার ক্রীতদাস কেনাবেচার বাজারে ক্রীতদাস চালান দেওয়া। এরা জাহাজে করে আসে। সঙ্গে নিয়ে আসে ঘোড়া। ঘোড়ায় চড়ে এরা এই দেশের শান্ত নিরুপদ্রব গ্রামগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা ভয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। তখন এরা ঘরগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। প্রাণ বাঁচাতে সবাই

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। তখন তাদের ধরে গলায় পরিয়ে দেওয়া হয় তিন-কোণা গাছের ডোলর এক রকম জিনিস। সেটার মধ্যে দিয়ে দড়ি ভরে দেওয়া হয়। কারো পক্ষে তখন দল ছেড়ে পালানো অসম্ভব। এইভাবে-পঞ্চাশ একশো অল্পবয়সী ছেলেমেয়েকে এরা বেঁধে নিয়ে যায় নিজেদের জাহাজে। তারপর চড়া দামে সেই সব ক্রীতদাসদের বিক্রি করে ইউরোপ-আমেরিকার ক্রীতদাস বেচা কেনার হাটে।

—কিন্তু তোমার ওপরে ওদের রাগের কারণ কী?

—কারণ আছে বৈ কি—মকবুল বলল—আমি যে ওদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিলাম।

—সেটা কী রকম?

—এই সব অঞ্চলে তখন কার্পেট বিক্রি করছিলাম। তখনই হঠাৎ একদিন দেখলাম নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর মর্মান্তিক অত্যাচার। আমি তখন সেই গ্রামটিতে ছিলাম। আমিও বাদ যাই নি। আমাকেও ধরে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। অবশ্য কাণা সর্দার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিয়েছিল। বারবার সাবধান করে দিয়েছিল, আমি যেন ওদের আসার খবর কাউকে না বলি। আমি অন্য গ্রামে গেলাম। সেখানে এই দস্যুদের আসবার কথা বলে দিলাম। সব লোক গ্রাম ছেড়ে পালাল। দস্যুদল গিয়ে দেখল, গ্রাম-ফাঁকা জনপ্রাণীও নেই। ওরা প্রথমে বুঝতেই পারেনি, গ্রামবাসীরা কার কাছ থেকে দস্যুদলের আসার খবর পেল। একচোখ কাণা দস্যুদলের সর্দার কিন্তু ঠিক বুঝল, এটা আমারই কাজ। গ্রাম-গ্রামান্তরে নানা উপজাতির সর্দারদের কাছে তখন কার্পেট বিক্রী করছি। খবরটা আমার পক্ষে রটানোই সম্ভব। আমি করেছিলামও তাই। গ্রাম-গ্রামান্তরে যেখানে গেছি, দস্যুদলের আসার খবর রটিয়ে দিয়েছি। গ্রাম ফাঁকা করে সবাই বনে-জঙ্গলে পালিয়ে গেছে। দস্যুরা এসে দেখেছে গ্রামকে গ্রাম শূন্য—খাঁ-খাঁ করছে। একটা মানুষও নেই। এইবার কাণা সর্দার হন্যে হয়ে আমাকে খুঁজতে লাগল। আমিও বিপদ আঁচ করে পালিয়ে এলাম এই তেকরুর বন্দরে। তারপর জাহাজে চড়ে নিজের দেশে পাড়ি জমালাম। এখন বুঝছি—দস্যুসর্দারের চোখে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়।

—হুঁ—ফ্রান্সিস বলল—তা'হলে তো সর্দার ব্যাটাকে একটু শিক্ষা দিয়ে দিলে ভালো হতো। যাক্‌গে—ফ্রান্সিস আপনমনে খেতে লাগল।

এখন কি করে ওঙ্গালির বাজারে যাওয়া যায়, তাই নিয়ে ওরা পরিকল্পনা স্থির করতে বসল। এইসব জায়গা সম্বন্ধে ফ্রান্সিস বা হ্যারি কারোই কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। একমাত্র ভরসা মকবুল। মকবুল বলল—এখান থেকে মাইল পাঁচেক পূর্বদিকে পর্তুগীজদের একটা দুর্গ আছে। আগে ওখানে পেঁছুতে হবে আমাদের, তারপর ইতিকর্তব্য স্থির করা যাবে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি দু'জনেই মকবুলের প্রস্তাবে রাজী হলো।

* * *

পরের দিন সকালবেলা ওরা যাত্রা শুরু করল পর্তুগীজদের দুর্গটার উদ্দেশ্যে। তেকরুর বন্দর এলাকা ছাড়তেই শুরু হল গভীর বন। এরই মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তামত রয়েছে। তেকরুর বন্দর থেকে দুর্গে মালপত্র নিয়ে যাওয়া-আসার জন্যে ঘোড়ায় টানা গাড়ী ব্যবহার করতে হয়। তাই গাড়ী চলার মত রাস্তা হয়েছে। দু'ধারে ঘন জঙ্গল। তারই

মাঝখান দিয়ে এই সরু রাস্তা ধরে ওরা হাঁটতে লাগল। এতদিন আফ্রিকার জঙ্গল সম্বন্ধে গল্পই শুনেছে ফ্রান্সিস। এবার চাক্ষুষ দেখল আফ্রিকার জঙ্গল কাকে বলে। বন যে এত নিবিড় হতে পারে, ফ্রান্সিস তা ভাবতেও পারে নি কোনোদিন। দুপুর নাগাদ ওরা দুর্গ-টার সামনে এসে হাজির হল। পাথরের তৈরী দুর্গটা বেশ বড়ই বলতে হবে। সিংহদরজা দিয়ে ওরা দুর্গে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেল। দ্বাররক্ষী কিছুতেই ওদের ঢুকতে দেবে না। ফ্রান্সিস ভাঙা-ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় বলল—ঠিক আছে—তুমি গিয়ে দুর্গ-রক্ষককে বলো—আমরা ব্যবসার ধান্ধায় এদেশে এসেছি। একটা রাত দুর্গে থাকবো।

দ্বাররক্ষী চলে গেল। একটু পরেই একজন বেশ বলশালী লোক দরজার দিকে এগিয়ে এল। তার পরনে যুদ্ধের পোশাক। তার পেছনে-পেছনে এল দ্বাররক্ষী। ফ্রান্সিস বুঝল—ইনিই দুর্গরক্ষক।

দুর্গরক্ষক বেশ ভারিক্কি গলায় জিজ্ঞেস করল—আপনারা কে?

—আমরা ব্যবসায়ী। ফ্রান্সিস উত্তর দিল।

—কীসের ব্যবসা আপনাদের?

ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি বলে উঠল—কার্পেটের।

—কই—আপনাদের সঙ্গে তো কার্পেট দেখছি না।

—আমরা এই এলাকাটা ভালো করে দেখছি—কার্পেট আনলে বিক্রি-বাট্টা হবে কি না।

—ও!

—আমরা আজ রাত্তিরের মত এখানে থাকতে পারি? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—নিশ্চয়ই। দুর্গরক্ষক রক্ষীটিকে কি যেন ইঙ্গিত করল। রক্ষীটি ডাকল—আসুন আমার সঙ্গে।

রক্ষীকে অনুসরণ করে ফ্রান্সিসরা একটা ঘরে এসে হাজির হলো।

দুর্গের মধ্যে বেশ পরিচ্ছন্ন একটা ঘর। ফ্রান্সিসদের সেখানে থাকতে দেওয়া হল। যাক্, রাত কাটাবার একটা আশ্রয় পাওয়া গেল। এবার আহারের ব্যবস্থা কি হবে? কিন্তু সে চিন্তা তাদের বেশীক্ষণ রইল না। খাবার সময়ে রক্ষী এসে তাদের ডেকে নিয়ে গেল।

রাত্রে মস্ত লম্বা একটা টেবিলে সবাই একসঙ্গে খেতে বসল! প্রায় পঞ্চাশজন সৈন্য দুর্গটায় থাকে। তাছাড়া আজকে রয়েছে দুর্গরক্ষকের দু'জন অতিথি আর ফ্রান্সিস ওরা। দেখতে-দেখতে দুর্গরক্ষক তার অতিথি দু'জনকে ফ্রান্সিসদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। অতিথিদের মধ্যে একজন বয়স্ক। তার নাম জন। অন্যজন যুবক। তার নাম ভিক্টর। ফ্রান্সিস জনের সঙ্গে আলাপ জমাল। হ্যারি আর মকবুল আলাপ করতে লাগল ভিক্টরের সঙ্গে। কথায়-কথায় জন বলল—আমরা এখানে এসেছি হাতী শিকার করতে। দাঁতাল হাতি মেরে দাঁতগুলো নিয়ে ইউরোপের বাজারে বিক্রি করবো। অবশ্য দাঁতগুলো নিয়ে যাবার সময় এই দুর্গরক্ষককেও কিছু প্রাপ্য অর্থ দিতে হবে।

ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—আপনারা কি হাতী শিকার করতে ওঙ্গালির বাজারে যাবেন?

—সেটা আমি তো ঠিক বলতে পারবো না। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে একজন এদেশীয় নিগ্রো। মাসাই উপজাতির লোক। এরা বাধ্য আর খুব ভালো তীরন্দাজ। সেই গাইডই জানে আমরা কোথা দিয়ে কোথায় যাবো।

—সেই গাইড কোথায় ?

—সে তার সঙ্গীদের সঙ্গে বারান্দায় বসে খাচ্ছে।

—তার সঙ্গী মানে।

—আমরা কুড়ি জন মাসাইকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। মালপত্র বওয়া, রান্না করা, বিষ মাখানো তীর দিয়ে হাতী শিকার করা, হাতীর দাঁতগুলো বয়ে আনা—এইসব ওরাই করবে।

—আপনার গাইডটিকে জিজ্ঞেস করুন তো সে ওঙ্গালির বাজার চেনে কিনা।

—ডাকছি—বলে যারা খাবার পরিবেশন করছিল, তাদের একজনকে ডেকে বলল—গাইডটাকে একবার ডেকে দিতে।

একটু পরেই নেংটি পরা খালি গায়ে একজন নিগ্রো এসে জনের সামনে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস অনেক চেষ্টা করেও লোকটাকে বোঝাতে পারল না। তখন মকবুল মাসাইদের ভাঙা-ভাঙ্গা ভাষায় জিজ্ঞেস করল—ওঙ্গালির বাজার চেনো ?

লোকটা মাথা ঝাঁকাল অর্থাৎ চেনে। মকবুল আবার জিজ্ঞেস করলো—ওখানে আমাদের নিতে যেতে পারবে ?

লোকটা মাথা ঝাঁকাল অর্থাৎ নিয়ে যেতে পারবে।

ফ্রান্সিস তখন জনকে বলল—আপনাদের সঙ্গে আমরাও যাবো।

—বেশ তো। জন খুশী হ'য়ে সম্মত হল। মকবুল তখন গাইডটাকে নিয়ে পড়ল। নানাভাবে বোঝাতে লাগল—ওরা যেখানে হাতি শিকার করতে যাবে, সেখান থেকে ওঙ্গালির বাজারে যাওয়া যাবে কিনা! লোকটাও বার-বার মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, হ্যাঁ, যাওয়া যাবে।

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে ফ্রান্সিস, হ্যারি আর মকবুলের মধ্যে কথা হতে লাগল। ফ্রান্সিস এই ভেবে খুশী যে, কিছুদিনের মধ্যে ওরা ওঙ্গালির বাজারে পেঁছুতে পারবে। তারপর হীরের পাহাড়। মকবুল বেশী কথা বলছিল না। খুব গম্ভীরভাবে কিছু ভাবছিল। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল—কি হে মকবুল, তুমি চুপচাপ যে!

—একটা কথা ভাবছি।

—কী ভাবছো ?

—জন সাহেবের গাইড কোন্ এলাকা দিয়ে নিয়ে যাবে জানি না। যদি উত্তর দিক্ দিয়ে আমরা ওঙ্গালির বাজারে যাই, তবে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু দক্ষিণ দিক দিয়ে গেলে সেই অঞ্চলে 'মোরান' নামে একদল উপজাতির পাল্লায় পড়বো। ভীষণ হিংস্র এই মোরান উপ-জাতির লোকেরা। এদের খাদ্য হলো শুধু কাঁচা মাংস, দুধ আর ষাঁড়ের রক্ত।

—কিন্তু আমরা তো আর তাদের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছি না। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহ'লেও। এরা সহজে কাউকে ছেড়ে দেয় না। এরা সব সময় যুদ্ধের পোশাক পরে থাকে। কোমরে ঝোলানো থাকে লম্বা দা, হাতে বর্শা আর তীর-ধনুক, কোমরের গোঁজে চকমকি পাথর, তারপর জলের থলি। সারা গায়ে-মুখে নানা রঙের উল্কি আঁকা।

—তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ মকবুল—ফ্রান্সিস হেসে বলল।

—হয় তো তাই। মকবুল পাশ ফিরতে-ফিরতে বলল।

* * *

সকালবেলা লোকজনের ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকিতে দুর্গের চত্বরটা মুখর হ'য়ে উঠল। মাসাই

কুলীরা সব মালপত্র নিয়ে তৈরী হল। ফ্রান্সিস, হ্যারি আর মকবুল তৈরী হ'য়ে এসে অপেক্ষা করতে লাগল জন আর ভিক্টরের জন্যে। একটু পরে জন আর ভিক্টর এল। কুলীদের লাইন করে দাঁড় করানো হল। সামনে রইল সেই গাইড। সঙ্গে জন আর ভিক্টর। লাইনের মাঝামাঝি রইল ফ্রান্সিস আর মকবুল। দলের শেষের দিকে রইল হ্যারি।

যাত্রা শুরু হল। দুর্গের সামনে বেশ বড় একটা মাঠ। তারপরেই শুরু হয়েছে গভীর জঙ্গল। গাইডটির হাতে একটা লম্বাটে দা। কোথাও-কোথাও দা দিয়ে জঙ্গল কেটে যাওয়ার পথ করে নিতে হচ্ছে। শুধু বন আর বন। কত রকমের গাছগাছালি, ফল-ফুলই বা কত রকমের। জঙ্গল এত ঘন যে সূর্যের আলো পর্যন্ত ঢুকতে পারছে না। আন্দাজেই বেলা বুঝে নিতে হচ্ছে। বনে আর কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না—শুধু বানর আর বেবুনের কিচিমিচি ডাক। সেই সঙ্গে বিচিত্র সব পাখির ডাক। দুপুর নাগাদ একটা ঝরণার কাছে এসে দলটি থামল। এবার খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে হল। ফ্রান্সিসের ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল। প্রাণ ভরে ঝরণার জল খেয়ে নিল। আঃ! কি সুন্দর স্বাদ জলের। ওর দেখাদেখি অনেকেই ঝরণার জল খেল! খাবারের বাক্স খোলা হলো। সবাইকে খেতে দেওয়া হ'ল। আসার সময় ফ্রান্সিস পথে কয়েকটা বনমুরগী দেখেছিল। মনে-মনে ঠিক করল—কালকে কয়েকটা বনমুরগী মেরে মাংস খেতে হবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু হল যাত্রা। গভীর জঙ্গলের মধ্যে পথ করে নিতে হচ্ছে। কাজেই তাড়াতাড়ি হাঁটা যাচ্ছিল না। থেমে-থেমে চলতে হচ্ছিল।

সন্ধ্যে হবার আগেই বনের রাস্তা অন্ধকারে ছেয়ে গেল। এবার রাত্তিরের জন্যে বিশ্রাম। ফ্রান্সিসদের একটা আলাদা তাঁবু দেওয়া হ'ল। রাতটা নির্বিঘ্নেই কাটল। তাঁবুর কাছেই একটা চিতাবাঘ কিছুক্ষণ ধ'রে গর্ গর্ ক'রে ডেকেছিল। পরে আর চিতাবাঘের ডাক শোনা যায়নি। শেষ রাত্তিরের দিকে দুটো হায়না তাঁবুর কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কুলীরা আগুন জেবলে শুয়েছিল। পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মারতে সে দু'টো পালিয়েছিল।

পরদিন সকালে তাঁবু আর জিনিসপত্র গোছ-গাছ করে আবার রওনা হল সবাই। সেই জঙ্গল কেটে পথ তৈরী করতে হল। গভীর বন। শুধু বাঁদর, বেবুন আর পাখির কিচিমিচি। সবাই সার দিয়ে চলছে। গতকালকের মত কয়েকটা বনমুরগীর দেখা পাওয়া গেল। ফ্রান্সিস আর লোভ সামলাতে পারল না। গাইড নিগ্রোটির কাছ থেকে তীর-ধনুক চেয়ে নিল। তারপর একটা মুরগীর দিকে নিশানা করে তীর ছুঁড়ল। কিন্তু তীরটা কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়ল। পরের বার আরো সাবধানতার সঙ্গে তীর চালাতে একটা মুরগী বিদ্ধ হল। এইভাবে সাতটা মুরগী মারা পড়ল। সেদিন দুপুরে মুরগীর মাংস দিয়ে খাওয়াটা ভালোই হল। খাওয়া-দাওয়ার পর একটু জিরিয়ে আবার যাত্রা শুরু হল!

সেই একঘেয়ে বন। বাঁদর, বেবুন আর পাখি-পাখালির ডাক। মাঝে সুন্দর ঝরণা। তৃপ্তিভরে ঝরণার জল খেয়ে নিল সবাই। তারপর আবার পথচলা। কুলীদের সর্দার পথ চলতে-চলতে কাঁপা-কাঁপা গলায় কী একটা দুর্বোধ্য গানের সুর ধরল। বাকী কুলীরা সবাই সেই সুরে গাইতে-গাইতে পথ চলল।

* * *

ছ'দিন পরের কথা। দুপুর নাগাদ ওরা একটা বিস্তীর্ণ মাঠের মত জায়গায় এসে উপস্থিত

হল। সেই মাঠে দলবন্ধভাবে চরে বেড়াচ্ছে অনেক জেব্রা। কুলীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। জেব্রার মাংস ওদের খুব প্রিয়। কুলীদের সর্দার তীর-ধনুক নিয়ে কয়েকটা বুনো ঝোপের আড়ালে-আড়ালে জেব্রাগুলোর অনেক কাছাকাছি চলে গেল। তারপর মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের বিরতিতে প্রায় একসঙ্গে পাঁচটা তীর ছুঁড়ল। সবগুলো তীরই একটা জেব্রার গলায়, পেটে, কাঁধে গিয়ে বিঁধলো। আহত জেব্রাটা ছুটে চলল। সর্দার কুলীও ছুটল। তার সঙ্গে আরো দু'তিনজন জেব্রাটাকে ধাওয়া করল। অন্যান্য জেব্রাগুলো ততক্ষণে পালিয়েছে। আহত জেব্রাটার সাদা-কালো ডোরাকাটা চামড়ায় রক্তের ছোপ লাগল। জেব্রাটা আর দ্রুত ছুটতে পারছিল না। বোঝা গেল, জেব্রাটা বেশ আহত হয়েছে। কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করবার পর জেব্রাটাই ক্লান্তিতে মাটিতে বসে পড়ল। তখন কুলীদের সর্দার আর কয়েকজন নিগ্রো কুলী মিলে জেব্রাটাকে বেঁধে নিয়ে এল। জেব্রাটাকে কাটা হল। তারপর আগুন জেবলে জেব্রার মাংস পুড়িয়ে ওরা মহানন্দে খেতে লাগল। সন্ধ্যে হ'য়ে এল। ঐ মাঠেই একটা নিঃসঙ্গী গাছের নীচে তাঁবু ফেললো। রাতটা নিরুপদ্রবেই কাটাল।

কিছু খেয়ে-দেয়ে সকালবেলা আবার যাত্রা শুরু হল। মাঠের এলাকা ছেড়ে আবার নিবিড় বনের মধ্যে দিয়ে দলটি এগিয়ে চলল। সেই গভীর বনের নীচে আধো আলো-অন্ধকারের মেশামেশি! তারই মধ্য দিয়ে পথ ক'রে দলটি এগিয়ে চলল।

হঠাৎ যেন জাদুমন্ত্রবলে কয়েকজন লোক দলটির চলার পথের ওপর এসে দাঁড়াল। মনে হলো, এতক্ষণ যেন ওরা এদে'র গতিবিধির ওপর নজর রেখেছিল। কারণ ওরা এদের যাবার পথের ওপরেই দাঁড়াল। অগত্যা দলটি থমকে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস দেখল, সেই লোকগুলি নেংটি পরে আছে। সারা গায়ে মুখে নানারঙের উলকি আঁকা। হাতে বর্শা তীর-ধনুক, কোমরে ঝোলানো লম্বাটে দা। মকবুল তখন ওর পাশে দাঁড়িয়েছে, ফ্রান্সিস বুঝতে পারেনি। মকবুল ফ্রান্সিসের কাঁধে হাত রাখতেই ফ্রান্সিস ফিরে তাকাল। বলল—কী ব্যাপার?

মকবুল ইশারায় আস্তে কথা বলতে বলল। তারপর চাপাস্বরে বলল—এরাই উপজতির লোক। এদের কথাই তোমাকে বলেছিলাম।

—কিন্তু এদের মতলবটা কি? ফ্রান্সিস চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করল।

—ঠিক বুঝতে পারছি না। মকবুল গলা নামিয়ে উত্তর দিল। ফ্রান্সিসদের দলের সামনে ছিল গাইডটি। তার সঙ্গেই এদের কথা-বার্তা চলল। গাইডটি ফিরে এসে জনকে বলল—এই লোকগুলি কাপড়, আয়না, চিরুনি, পুঁতির মালা এইসব চাইছে।

জন রেগে বলল—ওসব আমরা দেব না। তারপর আগন্তুক দলটির দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল—ভালো চাও তো রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াও।

লোকগুলোর মধ্যে যে দলপতি, তার গালে লম্বা কাটা দাগ। জনের কথা শুনে তার চোখ দু'টো যেন জ্বলে উঠল মুহূর্তের জন্যে। সে চীৎকার করে কী একটা ব'লে উঠল। তারপর যেমন বন ফুঁড়ে হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

জন এসব নিয়ে মাথা ঘামাল না। চেঁচিয়ে হুকুম দিল—চলো সব।

আবার হাঁটা শুরু হল। হাঁটতে-হাঁটতে মকবুল এক সময় ফ্রান্সিসের কাছে এল। ধীরে-ধীরে বলল—জন সাহেব কাজটা ভালো করল না।

—কেন ? ফ্রান্সিস বলল।

—ওরা সহজে ছেড়ে দেবে না। আপোসে মিটিয়ে নিলেই ভালো ছিল। কিন্তু তা না করে ওদের রাগিয়ে দেওয়া হল।

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। মনে-মনে ভাবল—মকবুল মিছিমিছি ভয় পাচ্ছে। কী করবে ওরা ? মকবুল কিন্তু ব্যাপারটা সহজ ভাবে নিল না। মাথা নীচু করে কী যেন ভাবতে-ভাবতে হাঁটতে লাগল। আবার মাঝে-মাঝে ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে বনের চারদিকে তাকিয়ে কী যেন দেখে নিতে লাগল। মকবুল যে ভীষণ ভয় পেয়েছে, এটা ওর চোখ-মুখ দেখেই ফ্রান্সিস বুঝতে পারল।

আরো দু'দিন হাঁটা পথে যাত্রা চলল। তিন দিনের দিন ফ্রান্সিসদের দল একটা ছোট পাহাড়ের নীচে উপস্থিত হল। এদিকে জঙ্গলটা তত ঘন নয়। একটু ছাড়াছাড়া গাছ-পালা। তারই মধ্যে দেখা গেল ইতস্ততঃ ছড়ানো হাতীর কঙ্কাল। গাইড বুঝিয়ে বলল—মরবার সময় উপস্থিত হলে হাতীরা নাকি বুঝতে পারে। তখন দল ছেড়ে বনের মধ্যে নিরুপদ্রব একটা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে শুয়ে পড়ে। তারপর হয় মৃত্যু। এসব জায়গাগুলো গাইডরা খুব ভালোভাবেই চেনে। সেই জন্যেই গাইডদের নিয়ে হাতীর দাঁত শিকার করতে আসা সুবিধাজনক ! দেখা গেল, পাহাড়টা একেবারে চাঁছাছোলা পাথরের ঢিবি। একটা গাছও নেই পাহাড়টায়। তবে একটা জলপ্রপাত আছে। আঁজলা ভরে সেই জলপ্রপাতের জল খেল অনেকেই।

হঠাৎ গাইডটিকে দেখা গেল উত্তেজিত ভঙ্গীতে ছুটে আসছে। গাইডটি যে সংবাদ দিল তা অপ্রত্যাশিত। পাহাড়টাতে একটা গুহা রয়েছে। সেখানে নাকি অনেক হাতির দাঁত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ফ্রান্সিস, জন, ভিক্টর সবাই ছুটল গুহাটার দিকে। বাইরের আলো থেকে প্রায় অন্ধকার গুহাটায় ঢুকে প্রথমে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আস্তে-আস্তে গুহার অন্ধকারটা সরে আসতে দেখা গেল অনেকগুলো হাতীর দাঁত ও হাতীর কঙ্কাল ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। জন আর দেরী করল না। কুলীদের হুকুম দিল দাঁতগুলো সব একত্র করে বেঁধে তাঁবুতে নিয়ে রাখতে। ফেরবার সময় প্রত্যেক কুলীকে একটা করে দাঁত বয়ে নিয়ে আসতে হবে।

হাতীর দাঁতগুলো নিয়ে আসার বন্দোবস্ত হচ্ছে, এমন সময় গাইড খবর নিয়ে এল, এক-পাল হাতী পাহাড়ের নীচের জঙ্গল ঝোপঝাড় ভেঙে এই দিকেই আসছে। তাড়াতাড়ি লম্বামত একটা বাক্স থেকে তীর বিষমাখা তীর-ধনুক বের করা হল। গাইডটি নিজে তীর-ধনুক নিল। তাছাড়া আরো দু'জনকে তীরধনুক দিল। তিনজন তিন জায়গায় দাঁড়াল। গাইডটি দাঁড়াল পাহাড়ের গায়ে-লাগা একটা বড় পাথরের ওপর। অন্য দু'জনের মধ্যে একজন পাহাড়ের নীচে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রইল। আর একজন দাঁড়াল পাথরের আড়ালে।

কিছুক্ষণ পরেই একদল হাতী গাছপালা, ঝোপঝাড় ভাঙতে-ভাঙতে এগিয়ে এল। যে-খানে এসে হাতীগুলো দাঁড়াল, সেখানটায় বন-জঙ্গল ছাড়া-ছাড়া। ওদের ওপর নজর রাখতে কোন অসুবিধে হল না। হাতীগুলোর মধ্যেই দু'টো হাতী দাঁতাল ছিল। বাকীগুলো মা-হাতী আর বাচ্চাহাতী। পাথরের ওপর থেকে গাইডটি চীৎকার করে বলল—'শুধু

দাঁতাল হাতী দু'টোকে মার'।

কথাটা শেষ হতে না হতেই তীর ছুটল। পাঁচ-সাতটা তীর পর-পর গিয়ে বিঁধল হাতী দু'টোর গায়ে। হাতী দু'টো কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল। তারপর এক সময় ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। অন্য হাতীগুলো ততক্ষণে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আবার তীর ছুঁড়ল। হাতী দু'টোর গায়ে বিদ্ধ হল তীরগুলো। হাতী দু'টো আর উঠতে পারল না। আস্তে-আস্তে মাটির ওপরে এলিয়ে পড়ল। তীব্র বিষের প্রতিক্রিয়া শুরু হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতী দু'টো জোরে-জোরে শ্বাস ছাড়তে-ছাড়তে মারা গেল। তখন কুলীদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। তারা সবাই ছুটে গেল হাতী দু'টোর কাছে। ওদের মধ্যে একজন ধারাল ছুরি দিয়ে হাতীর পেটটা গোল করে কাটল। তারপর ভেতরে ঢুকে হাতীর মস্তবড় মেটেটা কেটে নিয়ে এল। ততক্ষণে আর এক দল কুলী জঙ্গল থেকে শুকনো পাতা কাঠ এনে আগুন জ্বালিয়ে ফেলেছে। ফ্রান্সিস একবার ভাবল, ওদের বারণ করে। কারণ হয়তো হাতীটির রক্তের সঙ্গে-সঙ্গে মেটেটাও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বারণ করতে যাওয়া বৃথা। হয়তো এরকম অবস্থায় হাতীর মেটে এর আগেও ওরা খেয়েছে। ওরা হাতীর মেটে আগুনে ঝলসাতে লাগল। ফ্রান্সিসরা তীর দিয়ে যে বুনো মুরগী মেরেছিল—তাই রান্না চাপাল।

রান্না শেষ হলে ফ্রান্সিসরা কয়েকজন জলপ্রপাতে স্নান করতে গেল। গত বেশ কয়েক-দিন স্নান করা হয় নি। এখন স্নান করার সাধ মনের সুখে মেটাল ওরা। তারপর খেতে বসল। ওদিকে কুলীরা খাচ্ছে, আর এদিকে ফ্রান্সিসদের দল খাওয়া-দাওয়া চলছে। হঠাৎ বনের চারদিক কেমন যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। না পাখি-পাখালির ডাক, না বাঁদর, বেবুন, শিপাঞ্জীর কিচিরমিচির ডাক। ফ্রান্সিসের কাছে ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত লাগল। এ সময় মকবুল ফ্রান্সিসের কাছে সরে এলো। তারপর মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস, আমরা বোধহয় বিপদে পড়বো।

—কীসের বিপদ ?

—লক্ষ্য করো নি—এই জায়গাটা কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

—তাতে কী হয়েছে—

—কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারবে, মোরান উপজাতির লোকেরা সাংঘাতিক। বনের পশুপাখিও ওদের ভয় করে চলে। মকবুলের কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে জন চীৎকার করে নিজের খাবারের থালার ওপর ঝুঁকে পড়ল। দেখা গেল জনের পিঠে একটা তীর এসে বিঁধেছে। জন বারকয়েক উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। মাটিতে শুয়ে পড়ল। কী হল, সেটা বোঝবার আগেই আর একটা তীর এসে বিঁধলো ভিক্টরের পিঠে। ভিক্টর মাটিতে পড়ে কাতরাতে লাগল। মকবুল খাওয়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠল—ফ্রান্সিস, শীগ্গির পালাও। ফ্রান্সিস আর হ্যারি সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। ইতিমধ্যে দু' একজন কুলীর গায়ে তীর লেগেছে। তাদের মধ্যেও হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সবাই পালাতে চাইছে। এলোপাথাড়ি আরো কয়েকটা তীর ফ্রান্সিসদের আশেপাশে পড়ল।

ফ্রান্সিস, হ্যারি আর মকবুলকে আঙ্গুল দিয়ে পাহাড়টা দেখিয়ে চীৎকার করে বলল—পাহাড়ের দিকে চলো। তারপর তিনজনেই ছুটতে শুরু করল। কিন্তু একটু পরেই

ওদের থামতে হল। পাহাড়ের নীচে থেকে শুরু করে সমস্ত জঙ্গল এলাকায় ওদের চারদিক ঘিরে আস্তে-আস্তে জঙ্গলের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াতে লাগল—মোরান উপজাতির যোদ্ধারা। কোমরে ঝোলানো লম্বাটে দা। হাতে তীর-ধনুক আর বর্শা। মুখে খালি গায়ে উল্কি আঁকা। প্রায় শ' পাঁচেক হবে। পালাবার কোন উপায় নেই। ফ্রান্সিসরা আস্তে-আস্তে ওদের তাঁবুর কাছে এসে অপেক্ষা করতে লাগল দেখা যাক্, ভাগ্যে কী আছে?

মোরান যোদ্ধাদের মধ্যে একজন তীব্রস্বরে কু-উ-উ বলে ডাক দিল। সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত যোদ্ধারা বর্শা উঁচিয়ে একসঙ্গে আনন্দে চীৎকার করে উঠল। অর্থাৎ যুদ্ধে জয় হয়েছে। শত্রুরা পরাস্ত। প্রায় সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁবুগুলোর ওপর। জিনিসপত্র সব ছত্রাখান করে দিল। তারপর তাঁবুগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিল। সেই আগুন ঘিরে চলল উন্মত্ত নৃত্য। ফ্রান্সিসরা অসহায়ভাবে তাই দেখতে লাগল।


মোরান যোদ্ধাদের মধ্যে একজন তীব্রস্বরে কু-উ-উ বলে ডাক দিল।

একটু পরে পাঁচ-ছয় জন মোরান যোদ্ধা এগিয়ে এল ফ্রান্সিসদের দিকে। ওদের দলের প্রথমেই রয়েছে সেই গাল কাটা সর্দার। খুশীতে ওর চোখ দু'টো চিকচিক করছে। ফ্রান্সিসদের কাছে এসে লোকটা চীৎকার করে কী যেন বলল। সঙ্গে-সঙ্গে দু'তিনজন যোদ্ধা এগিয়ে এল। তারা ফ্রান্সিস, মকবুল আর হ্যারির হাত পেছনে দিকে বেঁধে ফেলল। লতাগাছ যে এত শক্ত হয়, ফ্রান্সিসের তা জানা ছিল না। বাঁধনটা যেন চামড়াটা কেটে বসে গেল।

এতক্ষণ বাক্স-প্যাঁটরা ভাঙা চলছিল। হঠাৎ ওদের নজরে পড়ল গুহা থেকে এনে জড়ো করে রাখা হাতীর দাঁতগুলো ওপর। একজন ছুটে এসে সর্দারকে বোধহয় সেই কথাই জানাল। সর্দার সব হাতীর দাঁতগুলো নিতে হুকুম দিল। এমন কি মরা হাতী দু'টোর দাঁতও ছাড়ানো হল। বোঝা গেল—ওরাও হাতীর দাঁতের মূল্য জানে।

ফ্রান্সিসদের হাত বাঁধবার সঙ্গে-সঙ্গে কুলীদের হাতও বাঁধা হয়েছিল। এটা হ্যারির নজরে পড়ল একবার। হ্যারি মকবুলকে ডাকল—মকবুল।

—কি?

—আমাদের ভাগ্যে যা আছে হবে। তুমি ওদের সর্দারকে বুঝিয়ে বলো যে, কুলীদের ওপর কোন অত্যাচার না করে। ওদের তো কোন দোষ নেই।

মকবুল গালকাটা সর্দারকে মোরানদের ভাঙা ভাষায় কথাটা বলল। সর্দার এক মুহূর্ত হ্যারির দিকে তাকাল। তারপর কী একটা বলে উঠতেই কুলীদের হাতের বাঁধন কেটে দেওয়া হল। এবার গালকাটা সর্দার ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে চলতে ইঙ্গিত করল।

পেছন থেকে কয়েকজন ফ্রান্সিসদের ধাক্কা দিল। সর্দার পাঁচ-ছয় জন সঙ্গী নিয়ে আগে-আগে চলল। তাদের পেছনে ফ্রান্সিসদের তিনজন। তাদের পেছনে অন্য সব মোরান যোদ্ধারা। ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলা শুরু হল। যতক্ষণ বনজঙ্গলের ছায়ায়-ছায়ায় হেঁটেছে ওরা ততক্ষণ গরম লাগে নি, কিন্তু যখনই বন ছাড়িয়ে ফাঁকা-ফাঁকা মেঠো জায়গা দিয়ে হাঁটতে হয়েছে, তখনই অসহ্য গরমে ঘেমে উঠেছে ফ্রান্সিসরা। পথে দু'জায়গায় মাত্র থেমেছিল ওরা জল খাবার জন্যে। বিকেল নাগাদ ওরা সকলে মোরানদের গ্রামে এসে পৌঁছাল। গোল-গোল পাতায় ছাওয়া বাড়ীগুলো। সামনে উঠোন—বেশ নিকোনো—পরিষ্কার। গ্রামের মধ্যস্থলে একটা উন্মুক্ত চত্বরে খুঁটির সঙ্গে ফ্রান্সিসদের তিনজনকে বেঁধে রাখা হল।

* * *

রাত হতেই শুরু হল জয়োল্লাস। ওদের ঘিরে মোরানদের নাচ শুরু হল। একজন তীক্ষ্ণস্বরে কী গাইতে লাগল। বাকীরা সবাই নাচতে লাগল। মশালের কাঁপা-কাঁপা আলোয় জায়গাটা যেন আরো ভয়ানক হয়ে উঠল। সারারাত ধরে ফ্রান্সিসরা কেউ দু' চোখের পাতা এক করতে পারল না। শেষরাতের দিকে মোরানদের উল্লাসে একটু ভাঁটা পড়ল। একটু পরেই ভোর হল। সারারাতের অতিনিদ্রায় ফ্রান্সিসের একটু তন্দ্রা এসে-ছিল। সেই তন্দ্রাটুকুও ভেঙে গেল সর্দারের হাঁকডাকে। একটা কিছুর আয়োজন চলছে, এটা ফ্রান্সিস বুঝল। কিন্তু আয়োজনটা কীসের, সেটা তখনও বুঝতে পারল না।

একটু বেলা হতেই দেখা গেল, গাঁয়ের লোকেরা সেই চত্বরে এসে গোল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটায় একটা হাঁড়িমত বসালো। তার সামনে বালি দিয়ে সীমা টেনে একটা গোলমত করা হল। তার ওপর গাছের শুকনো ডাল বিছিয়ে দেওয়া হল। সেই গোলের একটা দিক শুধু খোলা রইল। এসব দেখে মকবুল আস্তে ডাকল—'ফ্রান্সিস!'

ফ্রান্সিস মুখ ঘুরিয়ে মকবুলের দিকে তাকাল। দেখল—ভয়ে মকবুলের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। স্পষ্টই বোঝা গেল, ওর সারা শরীর কাঁপছে। ফ্রান্সিস বলল··· কী হয়েছে মকবুল?

মকবুল অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলল···'ফ্রান্সিস আমাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত।'

ফ্রান্সিস কথাটা শুনে চমকে উঠল। তবু শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল—কী করে বুঝলে?

—ঐ যে গোলমত জায়গাটা সাজাচ্ছে—ওখানে শুকনো ডাল গুলোতে ওরা আগুন দেবে। তারপর ঐ গোল জায়গাটায় ছেড়ে দেবে একটা বিষধর সাপ। গোলের যে দিকটা খোলা, সেইদিক দিয়ে সাপটা বেরোতে চেষ্টা করবে। আর সেখানে মাথা প্রায় মাটিতে ঠেকিয়ে রাখা হবে আমাদের কাউকে। আগুনের বেড়াজাল থেকে বেরোতে না পেরে সাপটা ক্ষেপে উঠবে। তারপর খোলা দিকটায় শোয়ানো মাথায় ছোবল মারবে।

বিমূঢ় ফ্রান্সিস কোন কথা বলতে পারল না। কী সাংঘাতিক? সত্যিই একটু পরে গোল করে সাজানো-শুকনো ডালগুলোতে ওরা আগুন লাগিয়ে দিল। জোর ঢাক বেজে উঠল। ঝুড়ি থেকে একটা সাপ বের করে ছেড়ে দেওয়া হলো সেই গোল জায়গাটায়। সাপটা যতবার বেরোবার চেষ্টা করলো, ততবারই আগুনের তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে ফুঁসতে লাগল।

এবার দু'তিনজন লোক মকবুলের কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর মকবুলকে টানতে লাগল। মকবুল বুঝল নিশ্চিত মৃত্যু। নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও যেন হঠাৎ মনোবল ফিরে পেল। চীৎকার করে বলে উঠল—ফ্রান্সিস এরা নানাভাবে কষ্ট দিয়ে মানুষ মারে। আমার মৃত্যু অবধারিত। তাই বলছি—তোমরা সুযোগমাত্র পালিও।

—কিন্তু কী করে? হতাশার ভঙ্গীতে ফ্রান্সিস বলল। লোকগুলো মকবুলকে ধরে টানাহ্যাচঁড়া শুরু করল। মকবুল দ্রুত বলে যেতে লাগল—'এরা বুনো হাতির দঙ্গলে মানুষ ছুঁড়ে দিয়ে মারে, কুমীরভরা নদীতে মানুষকে জোর করে ঠেলে দেয়। আর একটা খেলা খুব প্রিয়। সর্দার একটা তীর ছোঁড়ে। তারপর যাকে মারবে, তাকে বলা হয় ছুটে গিয়ে তীরটা খুঁজে বের করতে। সে ছুটতে শুরু করলেই এদের দলের একজন তাকে ধরতে ছোটে। যদি লোকটা তাকে ধরবার আগেই সে তীরটা খুঁজে পেয়ে যায়, তাহ'লে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়—নইলে মৃত্যু।' মকবুল হাঁপাতে লাগল। লোকগুলো মকবুলকে সজোরে টানতে লাগল। মকবুল গায়ের সমস্ত শক্তিতে ফ্রান্সিসের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। বলল—'যদি তীর খোঁজার খেলা হয়—তাহ'লে তীর খোঁজার জন্য দাঁড়িও না। প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে যেও। এছাড়া এদের কাছ থেকে বাঁচবার আর কোন পথ নেই। এদের কোনদিন বিশ্বাস করো না।'



মকবুল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সাপটির দিকে।

এবার লোকগুলো মকবুলের ঘাড় ধরে ধাক্কা দিতে লাগল। মকবুল আর বাধা দিল না। ওদের নির্দেশমতই চলল গোল জায়গাটার দিকে। গোল জায়গাটার যেদিকটা ফাঁকা সেইখানে মকবুলকে ঠেলে হাঁটু গেড়ে বসানো হল। তারপর জোর করে ওর মাথাটা নুইয়ে দেওয়া হলো। মকবুল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সাপটার দিকে। পালাতে গিয়ে বারবার আগুনের ছ্যাঁকা খেয়ে-খেয়ে সাপটা তখন ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ মকবুলের মাথাটা সামনে রেখে ফুঁসে উঠে ছোবল বসাল। চারপাশে ঘিরে দাঁড়ানো লোকেরা চীৎকার করে উঠল। মকবুল মাটিতে এলিয়ে পড়ল। ওর সারা মুখটা কালচে হয়ে উঠল। দু'একবার এপাশ-ওপাশ করতে-করতে স্থির হয়ে গেল মকবুলের শরীরটা। উল্লাসে মোরানরা চীৎকার করে উঠল। ঢাক বেজে উঠল।

ফ্রান্সিস অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল। কত সুখ-দুঃখের সঙ্গী মকবুল। এমনি করে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হল। চোখ ফেটে জল এল ফ্রান্সিসের। কিন্তু কাঁদতে পারল না। ঘটনার ভয়াবহতা তাকে কিছুক্ষণের মধ্যে বিমূঢ় করে দিল। পরক্ষণেই দৃঢ় হয়ে উঠল ফ্রান্সিস। যেমন করেই হোক এর শোধ তুলতেই হবে।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডাকল --'হ্যারি।'

হ্যারি মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। হয়তো যা ঘটে গেল, সেটা আন্দাজেই বোঝবার চেষ্টা করছে। তাকিয়ে দেখতে পারেনি। আস্তে-আস্তে মাথা তুলে হ্যারি ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি আমাদের ভাগ্যে কী আছে, জানি না। যা-ই ভাগ্যে থাকুক এবার হাতদু'টো খোলা পেলে এর প্রতিশোধ আমাদের নিতেই হবে—মনে থাকে যেন।

হ্যারি কোন কথা বলল না। মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আবার মাথা নীচু করে নিজের ভাবনায় ডুবে গেল।

বেলা বাড়তে লাগল। প্রচণ্ড রোদের মধ্যে খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় ওরা দাঁড়িয়ে রইল। গতকাল দুপুরে আধপেটা খাওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে একটা দানাও পেটে পড়ে নি। তার ওপর সারারাত ঘুম হয় নি। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেল—তবু ফ্রান্সিস জল খেতে চাইল না। হ্যারি জল খেতে চেয়েছিল। ফ্রান্সিস রেগে-ফুঁসে উঠেছিল—'হ্যারি- জল না খেতে পেয়ে যদি মরেও যাই, কোন দুঃখ নেই। কিন্তু এদের কাছ থেকে এক ফোঁটা জলও খেতে চাই না।' ওরা হ্যারির জন্য জল নিয়ে এল। কিন্তু হ্যারি মাথা নেড়ে জল খেতে অস্বীকার করল।

সূর্য তখন মাথার ওপরে—যেন আগুন ছড়াচ্ছে। গালকাটা সর্দার দু'জন সঙ্গী নিয়ে ওদের কাছে এল। সকলেরই পরনে যুদ্ধের সাজ। কোমরে লম্বাটে দা, একহাতে ধনুক, অন্য হাতে বর্শা। কোমরে জলের থলি আর চকমকি পাথর। সর্দার এগিয়ে এসে কী একটা বলল। একজন লোক এসে ফ্রান্সিস আর হ্যারির হাতের বাঁধন খুলে দিল। সর্দার কী একটা চীৎকার করে হুকুম করল। সর্দারের দু'তিন-জন সঙ্গী ফ্রান্সিসের পিঠে ধাক্কা দিয়ে চলতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি এগিয়ে চলল। সকলের সামনে গালকাটা সর্দার।

জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকামত জায়গায় সবাই এসে দাঁড়াল। সর্দারের হাতে তীর-ধনুক ছিল না। সে একজনের হাত থেকে তীর নিয়ে ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসদের বোঝাতে লাগল, কী করতে হবে ওদের। মকবুলের কথা ফ্রান্সিসের মনে পড়ল। এটা সেই তীর খুঁজে বার করার খেলা। এই শেষ সুযোগ—পালাবার একমাত্র উপায়—ফ্রান্সিস নিজের মনকে বোঝাল। খুব মৃদুস্বরে লক্ষ্য করে বলল—আমি যা-যা বলবো, মন দিয়ে শুনে সেই মত কাজ করবে। ফ্রান্সিস সর্দারের দিকে এবার মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝাল যে, সর্দার যা বলছে, সে তা বুঝতে পেরেছে। তারপরে সর্দারকে ইঙ্গিতে বোঝাল যে, দু'জনকেই একসঙ্গে ছুটতে দেওয়া হোক। সর্দার কী ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। সর্দারের হুকুমে ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে জামা-জুতো খুলে ফেলতে হল। এবার ধনুকে তীর লাগিয়ে যেদিকে তাক করল, সেদিকে বেশ কিছু দূরে একটা টিলা রয়েছে, দেখা গেল। ওদিকে যেতে হলে কাঁটাগাছের ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। খালি পায়ে যে কী অবস্থা হবে, ফ্রান্সিস সেটা সহজেই অনুমান করতে পারল। যাতে কাঁটাগাছ ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে বেশী জোরে ছুটতে না পারে, তার জন্যই জুতো খুলতে হুকুম দেওয়া হল। সর্দার আর সঙ্গীদের পায়ে কিন্তু চামড়া জড়ানো লতাপাতা দিয়ে বাঁধা জুতোর মত

জিনিস পরা। ওদের পক্ষে ছুটতে ততো অসুবিধে হবে না।

সর্দার টিলার দিকে লক্ষ্য করে একটা তীর ছুঁড়ল। তীরটা কোথায় পড়বে ফ্রান্সিস মোটামুটি আন্দাজ করে নিল। ফ্রান্সিস ছুটবে কিনা ভাবছে—সর্দার ওর গায়ে ধনুকের খোঁচা দিল। ফ্রান্সিস অস্ফুটস্বরে হ্যারিকে বলে উঠল—'টিলার তলায়'।

তারপর ছুটতে আরম্ভ করল। হ্যারি বুঝল, টিলার তলায় ফ্রান্সিস অপেক্ষা করবে।

একটু পরে সর্দার একজনকে ইঙ্গিত করতেই সে ফ্রান্সিসকে ধরতে ছুটল। সর্দার আবার তীর ছুঁড়ল। তীরটা বাঁদিক ঘেঁসে বেরিয়ে গেল। আগের তীরটা গিয়েছিল টিলার দিকে। হ্যারি ছুটতে শুরু করল।

এদিকে ফ্রান্সিস কিছুদূরে ছুটে আসতেই বুঝতে পারল, কাঁটাগাছে ঝোপঝাড়ে ওর দুটো পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। কিন্তু জীবন তার চাইতে মূল্যবান। তাই প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল টিলা লক্ষ্য করে। হঠাৎ নজরে পড়ল, তীরটা বুনো ঝোপে আটকে আছে। কিন্তু ফ্রান্সিস মুহূর্তের জন্যেও দাঁড়ালো না। সমান বেগে ছুটতে লাগল। টিলার তলায় পেঁছে ফ্রান্সিস একটা পাথরে বসে হাঁপাতে লাগল। একটু পরে হ্যারির অস্পষ্ট গলা শুনতে পেল। হ্যারি ডাকছে—'ফ্রান্সিস'।



লোকটা হঠাৎ ফ্রান্সিসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—'এই যে আমি এখানে।'

হ্যারি হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে বলল—'তুমি দৌড় শুরু করার একটু পরেই একজনকে পাঠানো হয়েছে তোমার সন্ধানে—হয়তো বা আমার পেছনে কাউকে পাঠানো হয়েছে। নষ্ট করার সময় নেই—দৌড়াও।'

ওরা ছুটতে শুরু করবে, এমন সময় পেছনের পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সর্দারের ছ'জন সঙ্গীর মধ্যে একজন। সেও হাঁপাচ্ছে, ফ্রান্সিস বলে উঠল—'হ্যারি, বাঁদিকের পাথরের আড়ালে যাও—ওখান দিয়েই বেরুবো আমরা।' লোকটা তখন কোমরে গোঁজা লম্বাটে দা-টা বের করে ফ্রান্সিসের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। হ্যারি একলাফে পাথরের আড়ালে চলে গেল। তারপর আড়াল থেকে বেরিয়ে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল। এদিকে ফ্রান্সিস এক দৃষ্টিতে লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটার দশাসই চেহারা, তার ওপর হাতে দা। ফ্রান্সিস নিরস্ত্র। সে পালাবার ফিকির খুঁজতে লাগল। লোকটা হঠাৎ ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস খুব দ্রুত উবু হয়ে বসে পড়ল, লোকটা তাল সামলাতে পারল না। উবু হয়ে পাথরের উপর গিয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস সুযোগ বুঝে ছুটতে লাগালো। লোকটা মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কপালে হাত-বুলাতে লাগল। ততক্ষণে ফ্রান্সিস অনেক দূরে চলে গেছে। লোকটা ওদের লক্ষ্য করে দা হাতে ছুটতে লাগল।

হ্যারি যেদিকে ছুটে গিয়েছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে ফ্রান্সিস ছুটতে শুরু করল। হঠাৎ ঝাঁকড়া-পাতা গাছের তলা থেকে হ্যারির চাপাস্বরে ডাক শুনতে পেল। গাছটার তলায় গিয়ে দেখল, হ্যারি ভয়ার্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। নিঃশব্দে দৌড়াবার ইঙ্গিত করল। আবার দু'জনের ছুট শুরু হলো। বেশ কিছুটা দৌড়োবার পর ফ্রান্সিস কান পেতে রইল, যদি পেছনে কোন শব্দ শোনা যায়। কিন্তু কোন শব্দ তো নেই। শুধু বাঁদর আর পাখির কিচিরমিচির। পেছনের জঙ্গলটা ভাল করে দেখার জন্যে সামনেই যে পাথরের ঢিবিটা ছিল, হ্যারি সেটাতে গিয়ে উঠল। তার-পর পেছনের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল—যদি অনুসরণকারী কাউকে নজরে পড়ে। হঠাৎ ফ্রান্সিসের মনে পড়ল ওদের হাতে তীর-ধনুক আছে। ফ্রান্সিস চাপা স্বরে ডাকল—'হ্যারি, শীগ্গির নেমে এসো।'

হ্যারি নামবার জন্যে মাত্র একটা পা তুলেছে, পেছনের জঙ্গল থেকে একটা তীর এসে হ্যারির পায়ে বিঁধল। হ্যারি একটু দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। পাথরের গা ঘেঁসে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস পাগলের মতো ছুটে গিয়ে প্রথমে এক হ্যাঁচকা টানে তীরটা খুলে ফেলল। তারপর মাথাটা কোলে তুলে নিল। হ্যারি হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল—ফ্রান্সিস, শীগ্গি পালাও।

—না, তোমাকে ছেড়ে যাবো না। এবার ফ্রান্সিসের চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল।

হ্যারি বলে উঠল—পাগলামি করো না ফ্রান্সিস- শীগগির পালাও। তোমার কাছে এখন এক সেকেণ্ডের দামও অনেক। পালাও শীগগির।

ফ্রান্সিস তবুও অনড় হয়ে বসে রইল। হ্যারির তখন কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে। অনেক কষ্টে বলতে লাগল—আমি বাঁচবো না—আমার জন্যে ভেবো না। তুমি পালাও।

—না। ফ্রান্সিস কাঁদতে-কাঁদতে বলল—আমি তোমাকে না নিয়ে যাবোই না।

হ্যারি শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে আস্তে-আস্তে উঠে ফ্রান্সিসের গালে একটা চড় মারল। উপবাসে অনিদ্রায় তৃষ্ণায় কাতর ফ্রান্সিসের শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠল।

—শীগগির পালাও—হ্যারি ক্লান্তস্বরে বলল। হঠাৎ পেছনের জঙ্গলে ঝোপে-ঝাড়ে শব্দ উঠল। ফ্রান্সিস আর বসল না। হ্যারির মাথাটা কোল থেকে মাটির ওপর নামিয়ে দিল! তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটতে শুরু করল। কিছুটা এগিয়ে যাবার পর পেছনে শুনল একজন লোকের হর্ষোল্লাস। নিশ্চয়ই হ্যারিকে দেখতে পেয়েছে।

ফ্রান্সিস প্রাণপণে ছুটতে লাগল। যতবার হ্যারির কথা মনে পড়েছে, ততবারই চোখে জল এসেছে। দু'গাল ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। বারবার চোখ মুছতে লাগল হাতের উলটো পিঠ দিয়ে। কিন্তু চোখের জল বাধা মানছে না। চোখের দৃষ্টি বারবার ঝাপসা হয়ে আসছে। চোখ মুছে নিতে হচ্ছে বারবার। ফ্রান্সিস মনে-মনে নিজের ওপরেই দোষারোপ করতে লাগল। কেন সে হ্যারিকে পথের টিবিটায় উঠতে বাধা দিল না। অনু-সরণকারীর হাতে তীর ধনুক আছে, এই কথাটা মনে করতে তার এত সময় লাগল কেন?

একটু সাবধান হলে হ্যারিকে এভাবে প্রাণ দিতে হত না। দু' দুজন সঙ্গীকে চিরদিনের জন্যে হারানোর বেদনা তার মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করল। তবু ভীত হল না ফ্রান্সিস। বরং প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয়ে উঠল তার মন। এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। হ্যারি আর ফিরবে না। মকবুলও নয়। তবু তাদের হয়ে প্রতিশোধ নিতে হবে। ফ্রান্সিস চোখ মুছল। না, কান্না নয়। বজ্রকঠিন হতে হবে। সংকল্পে দৃঢ় থাকতে হবে।

ফ্রান্সিস ছুটে চলল। এখন ভীষণ সাবধান হতে হবে। সজাগ থাকতে হবে। কোন শব্দই যেন কান এড়িয়ে না যায়। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ। নাক-চোখ-মুখ দিয়ে যেন আগুনের হালকা বেরোচ্ছে। একটু জল চাই। কপাল ভালো ফ্রান্সিসের। হঠাৎ একটা ঝরণার দেখা পেল। একটু জল খাওয়ার সময় হয়তো পাওয়া যাবে। ফ্রান্সিস জল খেতে হাঁটু গেড়ে বসল। কিন্তু জল খাওয়া হলো না। পেছনে শুকনো ডাল ভাঙার শব্দ উঠল। ফ্রান্সিস চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটতে শুরু করল।

এবার সামনেই পড়ল কয়েকটা বড়-বড় পাথরের টিলা। ফ্রান্সিস ছুটতে-ছুটতে টিলার ওপাশে চলে গেলো। পেছনেই একটা পাহাড়ী নদী। বেশী বড় নয়, কিন্তু তীব্র স্রোত। ফ্রান্সিস নদীর কাছে একটা বড় পাথরের আড়ালে বসে হাঁপাতে লাগল। একটু জিরিয়ে নিয়ে আঁজলা ভরে নদীর জল খেলো। তারপরে টিলার পাথরগুলোর আড়ালে-আড়ালে ওপরে উঠল। বেলা পড়ে এসেছে—তবু পাথরগুলো আগুনের মত গরম। একটা পাথরের গায়ে-গায়ে লেগে, আড়াল থেকে আস্তে-আস্তে মাথা তুলে দাঁড়াল। দেখল, বনজঙ্গলের মধ্যে থেকে অনুসরণকারীদের মধ্যে একজন মাথা নীচু করে কী যেন দেখতে-দেখতে এগিয়ে আসছে। ফ্রান্সিস বুঝল, এদের চোখে ধুলো দেওয়া প্রায় অসম্ভব। বনজঙ্গলের নাড়ী-নক্ষত্র ওদের জানা। ছুটে আসার সময় ফ্রান্সিসের পায়ের চাপে যে গাছগুলোর ডালডালা ভেঙেছে, লোকটা তাই দেখে ঠিক ফ্রান্সিসের পালাবার পথ চিনে নিচ্ছে। ফ্রান্সিস ভেবে দেখল, এই এক মস্ত সুযোগ। একজনের সঙ্গে তবু লড়া যাবে। কিন্তু গালকাটা সর্দার আর তার সঙ্গীরা এসে পড়লে ভীষণ বিপদ। মৃত্যু অনিবার্য। ফ্রান্সিস একটা ফন্দী বার করল।

টিলাটার নীচেই অনেকটা জায়গা জুড়ে বালি রয়েছে। তারই একধারে ফণীমনসা গাছের মত এক ধরনের গাছ। হাতী শিকার করতে যাওয়ার সময় ফ্রান্সিস এ ধরণের গাছ দেখেছে। এই গাছটার মোটা-মোটা পাতা ভেঙে দিলেই টপ্-টপ্ করে ঘন সাদা দুধের মত রস পড়তে থাকে। ফ্রান্সিস কিছু শুকনো পাতা জড়ো করে একটা গাছের নীচে রাখলে। তারপর গাছটার দু'টো পাতা ভেঙে দিল। টপ্-টপ্ করে শুকনো পাতাগুলোর ওপর রস পড়তেলাগল আর বেশ শব্দ হতে লাগল। শব্দ শুনলেই মনে হবে কেউ যেন শুকনো পাতার ওপর দিয়ে হাঁটছে। এবার ফ্রান্সিস একটা বড় গোছের পাথর কাঁধের ওপর তুলে ধরে রাখল। ওর এক মাত্র অস্ত্র। তারপর দাঁড়াল এসে সেই গাছটার ঠিক উল্টোদিকে একটা পাথরের আড়ালে। আশঙ্কা উত্তেজনায় ফ্রান্সিসের বুক টিপ্ টিপ্ করতে লাগল। সময় যেন আর কাটে না।

এক সময় দেখা গেল, সেই লোকটা খুব সন্তর্পণে বালির ওপর পা ফেলে-ফেলে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ লোকটা ফ্রান্সিসের দিকে পেছন ফিরে উল্টোমুখো হয়ে দাঁড়াল। নিশ্চয়ই শুকনো পাতায় গাছের রস পড়ার শব্দ কানে গেছে ওর। ফ্রান্সিস এই সুযোগের প্রতী-

-ক্ষাতেই ছিল। লোকটা চালাকি ধ'রে ফেলার আগেই কাজ সারতে হবে। ফ্রান্সিস আর দেরী করল না। দুই লাফে এগিয়ে এসে পাথরটা দু'হাতে তুলে প্রচণ্ড বেগে ঘা বসাল লোকটার মাথায়। লোকটা এই হঠাৎ আক্রমণে একদিকে যেমন হকচকিয়ে গেল, তেমনি মাথায় জোর ঘা লাগতে বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস আর এক মুহূর্তও দেরী করল না। ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার হাত থেকে বর্শা ছিনিয়ে নিল। লোকটাও উঠে ঘুরে বসেছে তখন। ফ্রান্সিসও সঙ্গে-সঙ্গে লোকটার বুক লক্ষ্য করে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বর্শা চালাল। 'অক্'—করে একটা শব্দ বেরিয়ে এল লোকটার মুখ থেকে। তার-পরেই লোকটা চিত হয়ে বালির ওপর পড়ে গেল। বার কয়েক ওঠবার চেষ্টা করল। তার-পর স্থির হয়ে গেল। হ্যারি আর মকবুলের মৃত্যুর প্রতিশোধ সে নিতে পেরেছে, এই ভেবে ফ্রান্সিস উল্লাসে চীৎকার করে উঠতে চাইল। কিন্তু বিপদের গুরুত্ব বুঝে চুপ করে রইল। হাঁপাতে-হাঁপাতে কপালের ঘাম মুছল। তারপর মৃত লোকটির কোমর থেকে লম্বাটে দা'টা নিল, বুক থেকে টেনে বর্শাটা খুলে নিল। ধনুক নিল—তীরগুলো নিল। জলের থলি আর চকমকি পাথর নিয়ে কোমরে। গুঁজল এবার জুতো। বুনো লতাপাতা দিয়ে বাঁধা চাম-ড়ার জুতোর মত জিনিসটা পায়ে পরে নিল। যখন নীচু হয়ে জুতো পরছে, তখনই বেলা শেষের একটা লম্বাটে ছায়া নড়ে উঠল। চকিতে মুখ তুলে তাকাতেই দেখল—আর একটা লোক। গালকাটা সর্দারের আর একটা সঙ্গী। লোকটা দাঁত বের করে হাসল। বীভৎস সেই হাসি। প্রকাণ্ড লোকটা কোমর থেকে লম্বাটে দা'টা খুলে নিল।



ফ্রান্সিস দ্রুতহাতে লোকটার পেটে বর্শাটি আমূল বিঁধিয়ে দিল।

শুরু হ'ল দা নিয়ে যুদ্ধ। দা'য়ে-দায়ে যখন ঘা লাগছে, ফ্রান্সিসের হাতটা ঝন্‌ঝন্ করে উঠছে। হাত অবশ হয়ে আসছে। উপবাসে অনিদ্রায় শরীরের যা অবস্থা, তাতে সামনা-সামনি-লড়াইয়ে এর সঙ্গে পেরে ওঠা অসম্ভব। অন্য পথ নিতে হবে। হঠাৎ ফ্রান্সিস নীচু হয়ে এক মুঠো বালি তুলে নিল। আর লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছুঁড়ে মারল লোকটার চোখে। লোকটার মুখের বীভৎস হাসি মিলিয়ে গেল। চোখ-মুখ কুঁচকে লোকটা এলোপাতাড়ি দা ঘোরাতে লাগল। । ফ্রান্সিস দ্রুতহাতে লোকটার পেটে বর্শাটা আমূল বিঁধিয়ে দিল। লোকটা পেটে হাত দিয়ে বসে পড়ল। টেনে বর্শাটা খোল-বার চেষ্টা করতে লাগল। পারল না। কাৎ হয়ে বালির ওপর শুয়ে শুয়ে গোঙাতে লাগল। লোকটার পেট থেকে বর্শাটা খুলে নিয়ে ফ্রান্সিস এগিয়ে চলল নদীটার দিকে। খুব সাব-ধানে নদীতে নামল। নদীতে জল বেশী নয়, তীব্র স্রোত। তার ওপর পাথরগুলো

শ্যাওলা ধরা। পা টিপে-টিপে সাবধানে নদী পার হলো। তার ওপারে উঠেই দেখতে পেল, বনের নীচে অন্ধকার জমে উঠেছে। অন্ধকারে ভালো করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এবার রাত্রির আশ্রয় খুঁজতে হয়। একটু এগিয়েই বনের মধ্যে কয়েকটা বিরাট আকারের গাছ জড়াজড়ি করে আছে দেখা গেল। তারই মধ্যে একটা গাছে ফ্রান্সিস উঠল। অনেকটা ওপরে একটা মোটা ডাল খুঁজে নিয়ে হেলান দিয়ে শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। শরীর যেন আর চলতে চাইছে না। মাথাটা খালি-খালি লাগছে। একটুক্ষণ চোখ বুজে থাকল। চোখ খুলতেই নজরে পড়ল গাছটায় বেশ কিছু ফল ঝুলছে। পাকা হলুদ রঙের ফলও রয়েছে। কিন্তু গাছটা কী গাছ—ফলগুলোই বা খাওয়া যায় কি না—এসব কিছুই জানা নেই। খিদের জ্বালায় ফ্রান্সিস ডাল বেয়ে-বেয়ে মগডালে উঠে কয়েকটা পাকা ফল পেড়ে নিয়ে এল। দা' দিয়ে কাটল। মুখ দিয়ে একবার চিবোতেই থুঃ থুঃ করে ফেলে দিল। কী অসম্ভব তেতো! ফলগুলো ফেলে দিল।

রাত গভীর হ'ল। দুর্বল-ক্ষুধাত শরীরে ঘুমও আসতে চায় না। হ্যারি আর মকবুলের কথা মনে পড়ল। ফ্রান্সিসের চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠলো। কোথায় রইলো বন্ধুরা, ওঙ্গালির বাজার আর হীরের পাহাড়। এই গভীর রাতে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত বন্য পরিবেশে ও গাছের ডালে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে।

হঠাৎ নদীর ধার থেকে ভেসে এল কাদের চড়া সুরের কান্না। নিশ্চয়ই গালকাটা সর্দারের দলের লোকদের কান্না। তা'হলে সর্দার তার সঙ্গীদের নিয়ে নদী পর্যন্ত এসে গেছে। তারাই তাদের দুই মৃত সঙ্গীদের জন্যে কাঁদছে। মৃতদেহ দুটো বোধহয় নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে। তার আগে এই কান্না। সারারাত চড়া সুরে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদল ওরা। ফ্রান্সিসের যতবার তন্দ্রা ভেঙে গেছে, ততবারই শুনতে পেয়েছে এই কান্না। হ্যারি আর মকবুলের জন্যে ফ্রান্সিসের মনেও কম বেদনা জমে নেই। ওরা তবু কাঁদছে—মনের ব্যথা-বেদনার ভার কমছে তা'তে। কিন্তু ফ্রান্সিস? কাঁদতেও পর্যন্ত পারছে না।

ফ্রান্সিস চোখ মুছে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ভোরের দিকে একটু ঘুম এসেছিল। ঘুম ভাঙতেই দেখল, ভোর হ'য়ে গেছে। তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে এল। তারপর ছুটতে শুরু করল। ছুট-ছুট। সর্দারের দলের সবাই এসে গেছে। কাজেই এবার ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই। ছুট—ছুট। পাগলের মত ছুটতে লাগল ফ্রান্সিস।

ছুটতে-ছুটতে একটা ফাঁকা মাঠের মত জায়গায় এসে পেঁছিল। একটা মাটির ঢিবির ওপর ব'সে ফ্রান্সিস হাঁপাতে লাগল। হঠাৎ নজরে পড়ল একটা সাপ ঢিবি থেকে বেরিয়ে এল। এই সাপটাকে মেরে খেলে কেমন হয়? ভাবতেই ফ্রান্সিসের খিদে আরো বেড়ে গেল। দা'য়ের এককোপে সাপটার গলার কাছ থেকে দু'টুকরো করে ফেলল। তারপর মাথাটা ফেলে দিয়ে দা' দিয়ে বাকীটুকুর চামড়া ছাড়িয়ে নিল। এবার টুকরো-টুকরো করে কেটে মুখে ফেলে চিবোতে লাগল। কাঁচা-কাঁচা স্বাদটুকু বাদ দিলে খেতে মন্দ লাগল না। খাওয়া শেষ হলে একটা ঢেঁকুর তুলল। যা হোক একটা কিছু তো পেটে পড়ল। তিন দিন হ'তে চলল—চান নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই—শরীর যেন আর চলতে চাইতে না। ছুটে আসতে-আসতে পথে একটু-একটু ক'রে জল খেয়েছে। জলের থলি খালি। জল

খাওয়া হ'ল না।

হঠাৎ সামনের দিকে নজর পড়তেই দেখা গেল,একটা বাচ্চা হরিণ বেড়াচ্ছে। এই হরিণের বাচ্চাটাকেই মারা যাক। ফ্রান্সিস বর্শাটা ভালো ক'রে বাগিয়ে ধ'রে ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটু গেড়ে চলতে লাগল। হরিণটার খুব কাছে এসে পড়ল ফ্রান্সিস। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েই বর্শাটা ছুঁড়ল। কিন্তু ক্ষুধার ক্লান্তিতে হাতটা কেঁপে গেল। বর্শাটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হতেই। হরিণটা এক ছুটে পালিয়ে গেল।

বর্শাটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে হরিণ টাকে খুঁজতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল। ঠিক তখনই নজরে পড়ল একটা ডোবার মতো জলাশয়। ফ্রান্সিস নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। দু'তিন বার চোখটা ঘষল। নাঃ—মিথ্যা নয়। সত্যিই একটা জলাশয়। ফ্রান্সিস একটু অস্পষ্ট চীৎকার করে সোজা ছুটল জলাশয়টার দিকে। তারপর সারা গায়ে জল ছিটোতে লাগল। শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল। থলিটাতে জল ভরে নিল। হঠাৎ লোকজনের কথাবার্তা কানে যেতেই তাড়াতাড়ি জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ল একটা গ্রাম। খড়ে ছাওয়া বাড়ি-ঘর। পরিস্কার তকতক করছে উঠোন। ফ্রান্সিস আরো ভালো ক'রে দেখতে চাইল। তাই নীচু হ'য়ে কিছুটা এগিয়ে এসে একটা বুনো খেজুর গাছের আড়ালে বসে দেখতে লাগল। কোন্ উপজাতি এরা, ফ্রান্সিস বুঝল না। তখন গ্রামের লোকজনের দুপুরের খাওয়া চলছে। ফ্রান্সিসের ক্ষিদে দ্বিগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু উপায় নেই। রাত্রি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

সন্ধ্যের মধ্যেই গ্রামবাসীরা রাত্রির খাওয়া খেয়ে নিল। তারপর সবাই গ্রামটার মাঝামাঝি একটা জায়গায় এসে জমায়েত হ'ল। চাঁদের ম্লান আলোর চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়াল সবাই। ঢোলের মত মাটিতে বসানো একটা বাজনা বাজিয়ে নাচ আর গান শুরু হ'ল। একজন মিহি সুরে গান ধরল। সে থামলে যারা নাচছিল, তারা সেই সুরে গান গাইতে লাগল। সেই সঙ্গে চলল নাচ। অনেক রাত অব্দি হল্লা চলল। তারপর তারা কেউ-কেউ ঘুমুতে ঘরে গেল—কেউ-কেউ বা গরমের জন্যে তালপাতার চ্যাটাই পেতে বাইরেই শুলো।

সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে গাছের আড়ালে থেকে বেরিয়ে এল। তারপর পায়ে-পায়ে এগোলো সামনেই যে বাড়িটা পড়ল তার দিকে। ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। তারপর রান্না করা খাবার-দাবার যা অবশিষ্ট ছিল, সব নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। ঠিক তখনই দেখল, একটা তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলে চ্যাটাইয়ের বিছানা ছেড়ে উঠে বসেছে। চাঁদের ম্লান আলোয় ছেলেটি অবাক্ চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস বুঝলো—ছেলেটি তাকে নিশ্চয়ই খাবার চুরি করতে দেখেছে। কী আর করা যায়। ফ্রান্সিস মুখের ওপর আঙুল রেখে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করল। ছেলেটি কিন্তু এবার ভয় পেল। পাশে শোয়া বাবাকে ডাকতে লাগল। কী যেন বারবার বলতে লাগল। ওর বাবা বিরক্তির ধমক দিতে। পাশ ফিরে শুল। ছেলেটিও আর কোন কথা না বলে শুয়ে পড়ল।

গাছের আড়ালে বসে ফ্রান্সিস গোগ্রাসে খাবার গুলো গিলতে লাগল। সেই খাবারের কীই বা গন্ধ, কীই বা স্বাদ—কিছুই বুঝে ওঠার মত মনের অবস্থা ফ্রান্সিসের ছিল না। শুধু

খাবারটা গোগ্রাসে খেতে লাগল। খাওয়া শেষ হলে ফ্রান্সিস সেই জলাশয়টার ধারে গেল। পেট ভরে জল খেয়ে বুনো খেজুর গাছের আড়ালে ফিরে এসে বসল। ঘুম পাচ্ছে। ফ্রান্সিস কয়েকটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে এল। সেগুলো পেতে বিছানার মত করল। তারপর সটান শুয়ে পড়ল। অসহ্য ক্লান্তিতে শরীর এলিয়ে পড়ল। সব দুশ্চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলে ঘুমিয়ে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

পাখি-পাখালির ডাকে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল অনুসরণকারী গালকাটা সর্দার আর তার সঙ্গীদের কথা। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে বসল। তারপর চারিদিকে সাবধানে তাকিয়ে দেখে নিল। না! কেউ নজরে পড়ছে না। ফ্রান্সিস নিশ্চিত হয়ে গাছে ঠেস দিয়ে বসল। গ্রামটার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হলো! কাল রাত্তিরে কত নাচগান বাজনা চলেছিল। এই সকালবেলাতেই কোথায় গেল সব। এখন গ্রামটাকে পরিত্যক্ত শ্মশানের মত মনে হচ্ছে।

একটু বেলা হতেই দেখা গেল গ্রামের শেষ প্রান্তের দিক থেকে একদল অশ্বারোহী লোক ছুটে আসছে। সকালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠছে তাদের হাতের তরোয়াল। তাদের পরনে আরবীয় পোশাক। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের আসার কারণটা স্পষ্ট হল। ঘরের দরজা ভেঙে তারা সবাইকে টেনে-টেনে বের করতে লাগল। কেউ বাধা দেবার চেষ্টা করলে তরোয়ালের ঘায়ে তাকে মেরে ফেলতে লাগল। এতক্ষণে ফ্রান্সিসের মনে পড়ল মকবুলের কথা। মকবুল বলেছিল, কী করে একদল লোক দেশের নিরীহ গ্রামবাসীদের ধরে জাহাজে করে ইউরোপে-আমেরিকায় ক্রীতদাস বেচা-কেনার বাজারে নিয়ে যায়। কী অমানুষিক অত্যাচার! ওরা যাদের ধরেছিল, তাদেরই গলায় তিনকোণা গাছের ডালের একটা বেড়ীর মত পরিয়ে দিচ্ছিল, তারপর বেড়ীগুলো দড়ি দিয়ে পরপর বেঁধে দু'তিনজন অশ্বারোহী টেনে নিয়ে যেতে লাগল। নিশ্চয়ই এখান থেকে হাঁটিয়ে ওদের জাহাজে নিয়ে গিয়ে তোলা হবে। তারপর চালান দেওয়া হবে। হঠাৎ ফ্রান্সিসের নজর পড়ল সর্দারের ওপর। আরে! এটাই তো সেই লোক। বাঁ চোখটা কাপড়ের ফালিতে ঢাকা—এক চোখ কাণা লোকটা। তেকরুর বন্দরের সরাইখানায় এই লোকটাই তো মকবুলের দিকে তেড়ে গিয়েছিল। সেদিন হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছিল। আজকে এই সর্দারের দফা-রফা করতেই হবে। রাগে ফ্রান্সিস কাঁপতে লাগল। ইতিমধ্যে অনেক বাড়ীঘরেই আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সকালের আকাশ ভরে উঠেছে ভয়ার্ত মানুষদের কান্না আর চীৎকারে। কী নির্মম এই ক্রীতদাসের ব্যবসায়ীরা। গত রাত্রের সেই ছেলেটা ওর বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। অশ্বারোহী লোকটার ভ্রুক্ষেপ নেই। গলায় বাঁধা দড়িটা টেনে নিয়ে চলেছে।

ফ্রান্সিসের আর সহ্য হল না। গাছের আড়াল থেকে একলাফে বেরিয়ে এসে বর্শা হাতে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলল কানা সর্দারের দিকে। কেউ কিছু বোঝবার আগেই ফ্রান্সিস ঘোড়ায় বসা সর্দারের বুকে বর্শাটা বিঁধিয়ে দিল। সর্দার ঘোড়া থেকে উল্টে মাটিতে পড়ে গেল। সর্দারের ধারে-কাছে যারা ছিল, তারা হইচই করে উঠল। তারপর ফ্রান্সিসের পেছনে ছুটল। ফ্রান্সিস প্রাণপণে ছুটতে-ছুটতে একটা জলপ্রপাতের কাছে এল। তারপর এক মুহূর্ত দেরী না করে জলপ্রপাতে ঝাঁপ দিল। জলের টানে কোথায় ভেসে গেল—অশ্বারোহী দস্যুর দল তার কোনো হদিসই করতে পারল না।

ফ্রান্সিসের মনে হলো জলের টানটা কমেছে। জল থেকে মুখ তুলে জলপ্রপাতটা আর দেখতে পেল না। অনেকটা দূরেই চলে এসেছে। এবার পাহাড়ী নদীটার ধারে এসে পাড়ে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু শরীর এত দুর্বল যে, স্রোতের বিপরীতে দাঁড়াতে পারছে না। হঠাৎ পারের দিক থেকে একটা বাড়িয়ে ধরা হাত দেখে ফ্রান্সিস চমকে উঠল। ও—সেই গত রাত্রিতে দেখা ছেলেটা হাত বাড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস ছেলেটার হাত ধরল। তারপর বেশ কষ্ট করেই নদীর পাড়ে উঠে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

* * *

কতক্ষণ শুয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ কে যেন গায়ে ধাক্কা দিতে লাগল। ফ্রান্সিস চোখ মেলে তাকাল। সেই ছেলেটি। সে আস্তে উঠে বসল। দেখল, ছেলেটির হাতে ধরা একটা পাতায় কী সব খাবার। একটা মাছও সেদ্ধও রয়েছে তার মধ্যে। ফ্রান্সিস পাতাটা টেনে নিল। তারপর খেতে লাগল আরাম করে। ছেলেটি মুখ দেখে মনে হলো, ছেলেটি খুব খুশী হয়েছে। কেউ কারো কথা বুঝল না। তাই দু'জনেই তাকিয়ে আছে দু'জনের দিকে।

একটু সুস্থ হয়ে হাঁটতে লাগল। ছেলেটিও তার সঙ্গে-সঙ্গে চলল। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা পাহাড়ী জায়গায় এসে দাঁড়াল ওরা। সেখান থেকে অনেক দূরে ছেলে-টির গ্রাম দেখা গেল। গ্রামের কিছু-কিছু ঘরবাড়ি অর্ধদগ্ধ হয়ে পড়ে আছে। ছেলেটি কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ফ্রান্সিসকে ইঙ্গিতে বলল—আমি গ্রামে যাবো। ফ্রান্সিস আপত্তি করল। কে জানে, আরবীয় দস্যুরা এখনও ওৎ পেতে আছে কিনা। কিন্তু ছেলেটি কোন কথাই শুনল না। আস্তে-আস্তে পা বাড়াল নিজের গ্রামের দিকে। কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল ছেলেটার ওপর। ফ্রান্সিসের চোখে জল এল।

ছেলেটি চলে যেতে ফ্রান্সিস আবার একা হয়ে গেল। কেউ কারো কথা না বুঝলেও ছেলেটি সঙ্গী তো ছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ফ্রান্সিসের। হঠাৎ মনে পড়ল—অনুসরণকারী গালকাটা সর্দার আর তার সঙ্গীদের কথা। ফ্রান্সিস দ্রুত পা চালাল।

এদিকে ফ্রান্সিসকে অনুসরণকারী দলের নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া লেগে গেল। এক-জন আর বেশী দূর যেতে আপত্তি করল। সে বার-বার বলতে লাগল—নিজেদের গ্রাম থেকে আমরা অনেক দূরে এসে পড়েছি। একটা লোকের জন্য আমাদের এই ছুটোছুটি করা অর্থ-হীন। সে শুধু আপত্তিই করল না। একেবারে বেঁকে বসল। সর্দার বোঝাবার চেষ্টা করল! কিন্তু লোকটা শুনল না। সে উল্টোমুখে নিজেদের গ্রামের উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করল। কিন্তু বেশীদূর যেতে পারল না। সর্দার ছুটে এসে তার পিঠে বর্শা বসিয়ে দিল। লোকটা উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। দু' একবার কাতর আর্তনাদ করল। তারপর মারা গেল। রইল সর্দার আর তিনজন। তারা এবার ফ্রান্সিসের যাওয়ার পথের নিশানা খুঁজতে লাগল।

ওদিকে ফ্রান্সিস দ্রুত পায়ে ছুটতে লাগল। প্রচন্ড গরমে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে যেন। মাথার ওপরে সূর্য যেন আগুন ছড়াচ্ছে। ফ্রান্সিসের মাথা ঘুরতে লাগল। চোখের সামনে সবকিছু যেন ঝাপসা হয়ে আসছে।

ফ্রান্সিস এ-সময় যাচ্ছিল হলুদ নুড়ি ছড়ানো একটা পাহাড়ে জায়গা দিয়ে টলতে-

টলতে। নুড়িগুলো ওপর প্রায় পড়ে যেতে-যেতে ফ্রান্সিস হঠাৎ ভীষণভাবে চমকে উঠল। নুড়িগুলোর গায়ে-গায়ে জড়িয়ে আছে, কত বিচিত্র রঙের কত রকম সাপ। ফ্রান্সিস শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে দ্রুত ছুটে পেরিয়ে গেল সাপের জায়গাটা! তারপর একখণ্ড ঘাসের জমির ওপর বসে হাঁপাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই ফ্রান্সিসের অনুসরণকারী দলটি এই সাপজড়ানো নুড়িগুলোর ওপর এসে দাঁড়াল। তারাও বুঝতে পারে নি যে, এক জায়গায় এত সাপ রয়েছে। একটা সাপ একজনের পায়ে জড়িয়ে ধরল। সে ঝাঁকুনি দিয়ে দূরে ছুড়ে দিল সাপটাকে। কিন্তু আর সবাইকে সাবধান করবার আগেই একজনের পায়ে সাপ কামড়াল। লোকটা মাটিতে পড়ে গেল। এতক্ষণে সবাই বুঝল, কী সাংঘাতিক জায়গা দিয়ে ওরা যাচ্ছে। তারা সঙ্গীকে রেখেই দৌড়ে পালিয়ে গেল। গালকাটা সর্দারের সঙ্গী রইল মাত্র দু'জন। তবু ছাড়ল না। দু'জন সঙ্গী নিয়েই সে ছুটতে লাগল। তাড়াতাড়ি ছোটবার জন্যে ওরা তীর-ধনুক বর্শা ফেলে দিয়েছিল। শুধু লম্বাটে দা'গুলো কোমরে ঝোলানো রইল।


তীরগুলো চারিদিকের শুকনো গাছগুলোর উপর ছুঁড়ে মারতে লাগল।

কী একটা শব্দ হ'তে ফ্রান্সিস পিছনে ফিরে তাকাল। দেখলো দু'জন সঙ্গী নিয়ে গালকাটা সর্দার ছুটে আসছে। ফ্রান্সিস সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে লাগল। ছুট-ছুট— প্রাণপণে ছুটতে লাগল ফ্রান্সিস। ছুটতে-ছুটতে সে একটা মালভূমির মত জায়গায় এসে দাঁড়াল। দেখল, চারপাশের গাছগাছালি কেমন শুকনো। অসহ্য গরমে ঘাসগুলো পর্যন্ত শুকিয়ে খড়ের মত হয়ে গেছে। দূরে দেখা গেল, ঢালু পাহাড়ে জায়গা ধরে সর্দার সঙ্গী সহ ছুটে আসছে।

ফ্রান্সিস তীরধনুক হাতে নিল। কিছু শুকনো ঘাস ছিঁড়ে কয়েকটা তীরের মাথায় বাঁধল। তারপর চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে তীরগুলো চারিদিকের শুকনো গাছগুলোর ওপর ছুঁড়ে মারতে লাগল। গাছগুলো এত শুকনো এত ছিল যে, তীরগুলো এসে পড়বার সঙ্গে-সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠলো। মালভূমির মত জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস দেখল, চারিদিকে আগুনের লেলিহান শিখা।

সর্দার আর তার সঙ্গীরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আগুনের জাল পেরিয়ে ফ্রান্সিসকে ধরা অসম্ভব। আর ফ্রান্সিস তীর-ধনুক আর বর্শা হাতে আনন্দে নাচতে লাগল। সর্দার শুধু তাকিয়ে-তাকিয়ে ফ্রান্সিসের নাচ দেখতে লাগল। রাগে সর্দারের

মুখটা আরো কুৎসিত হয়ে উঠল। কিন্তু কোন উপায় নেই। প্রায় সারারাত আগুন জ্বলল। ফ্রান্সিস আগুনের মাঝখানে একটু নিশ্চিন্তে রাতটা কাটাল।

ভোর হতেই ফ্রান্সিস লাফিয়ে-লাফিয়ে গাছের পোড়া কাণ্ড ডাল-পালা পার হয়ে আবার ছুটতে শুরু করল। এক সময় পিছন ফিরে দেখল—সর্দার তার সঙ্গী দু'জনকে নিয়ে ছুটে আসছে। উপবাসে অনিদ্রায়, উৎকণ্ঠায় ফ্রান্সিসের শরীর আর চলছিল না যেন। তবুও সে পাগলের মত ছুটতে লাগল। কিন্তু দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে। সর্দার আর সঙ্গীদের পায়ের চাপে ঝোপ-ঝাড়ের ডালপালা ভাঙার শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস হাঁ করে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে লাগল। শরীরে আর একফোঁটা শক্তি নেই। ক্লান্তিতে, অবসাদে ইচ্ছে করছিল মাটিতে শুয়ে পড়ে বিশ্রাম নেয়। কিন্তু পেছনেই ওরা যমদূতের মত আসছে। আর দৌড়তে পারছে না ফ্রান্সিস। ওর মাথা ঘুরতে লাগল।

হঠাৎ বনটা শেষ হয়ে গেল। ফ্রান্সিস দেখলো। সামনেই মাঠ পেরিয়ে পর্তুগীজদের সেই দুর্গটা। ফ্রান্সিস আর ছুটতে পারল না। চোখের সামনে সবকিছু দুলছে যেন। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। ফ্রান্সিস মাঠের মধ্যেই শুয়ে পড়ল।

গালকাটা সর্দার বনের মধ্যে থেকেই দেখতে পেল ফ্রান্সিস মাটিতে শুয়ে পড়েছে। সর্দার সঙ্গী দু'জনকে বনের মধ্যেই অপেক্ষা করতে বলল। তারপর নিজে ছুটে এল ফ্রান্সিসের কাছে। ফ্রান্সিস দেখল, কী ভয়ংকর হয়ে উঠেছে সর্দারের মুখ। সর্দার কোমর থেকে দা'টা খুলে নিল। তারপর দা'টা উঁচিয়ে ধরল। ফ্রান্সিস মাটিতে গড়িয়ে-গড়িয়ে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। সর্দার দা'টা উঁচু করে কোপ মারতে গেল। ঠিক তখনই একটা তীর এসে সর্দারের ডান কাঁধে বিঁধল। সর্দার দা'টা ফেলে কাঁধে হাত দিয়ে চেপে বসে পড়ল। আরো কয়েকটা তীর এখানে-ওখানে লাগল।

ফ্রান্সিস দেখল দুর্গটা থেকে জন পঞ্চাশেক পর্তুগীজ তীরন্দাজ পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসছে। গালকাটা সর্দার তীরন্দাজ বাহিনীকে দেখল। হাত দিয়ে তখন রক্ত ঝরছে। একবার ফ্রান্সিসের দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে নিয়ে এক ছুটে বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। বনের আড়াল থেকে সর্দার আর সঙ্গী দু'জন তাকিয়ে রইল ফ্রান্সিসের দিকে। হাতের শিকার ফসকে গেল। ফ্রান্সিস দেখল, তীরন্দাজ বাহিনী অনেক কাছে এসে পড়েছে। আর কিছু দেখতে পেল না। চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেল।

পর্তুগীজ সৈন্যরা অজ্ঞান ফ্রান্সিসকে ধরাধরি করে দুর্গের দিকে নিয়ে চলল। ঝোপ-জঙ্গলের আড়াল থেকে গালকাটা সর্দার আর তার সঙ্গীরা অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল। কিছুই করবার নেই। শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে।

* * *

ফ্রান্সিস যখন জ্ঞান ফিরে পেল, দেখল দুর্গেরই একটা পরিচ্ছন্ন ঘরে সে শুয়ে আছে। আগেরবারও তাদের এই ঘরটাতেই থাকতে দেওয়া হয়েছিল। ওর জ্ঞান ফিরে এসেছে দেখে একজন সৈন্য বিছানার দিকে এগিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল—কিছু খাবেন?

ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে জানাল সে খাবে। ফ্রান্সিসের ক্ষুধার বোধই ছিল না। তবু ভাবল—কিছু খেলে হয়তো শরীরটা ভালো লাগবে। সৈন্যটি চলে যাবার একটু পরেই দুর্গাধ্যক্ষ হেনরী দু'জন সৈন্য নিয়ে ঢুকে। ফ্রান্সিসকে বললো—কেমন আছেন?

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে জানাল, সে ভালো আছে।

হেনরী জিজ্ঞেস করল—আপনার সঙ্গী দু'জন কোথায় ?

হ্যারি আর মকবুলের কথা মনে পড়ল। চোখ ছলছল করে উঠল ফ্রান্সিসের। ভারী গলায় আস্তে-আস্তে বলল—ওরা কেউই বেঁচে নেই।

—আপনারা নিশ্চয়ই মোরান উপজাতিদের পাল্লায় পড়েছিলেন। এই উপজাতির লোকেরা সাংঘাতিক হিংস্র। আবার ধর্মভীরুও খুব। জঙ্গলের নানা গাছ-পাথর পুজো করে। যাক গে, আপনি যে বেঁচে আসতে পেরেছেন—এটাই মহাভাগ্যি আপনার।

এমন সময় একজন সৈন্য খাবার-দাবার নিয়ে ঢুকল। হেনরী বলল—নিন, এখন চারটি খেয়ে নিন—পরে কথা হবে।

দুর্গাধ্যক্ষ হেনরী চলে গেল। ফ্রান্সিস বিছানায় উঠে বসল। তারপর আস্তে-আস্তে খেতে লাগল। সবকিছুই বিস্বাদ লাগছে। তবু না খেলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে।

খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগল—এখন কী করবো ? ওঙ্গালির বাজারে যাওয়া, হীরের পাহাড়ের খোঁজ করা, একা-একা সম্ভব নয়। আরো কয়েকজনকে চাই। আর যদি হীরেটা পাওয়াই যায়, সেটা নিয়ে আসার জন্যেও আরও লোকজন চাই, গাড়ি চাই। এখন দেশে ফিরে যাওয়াই ভালো। গাড়ি-ঘোড়া লোক-জন নিয়ে আবার আসবো। এত সহজে হাল ছেড়ে দেব না। এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

ফ্রান্সিস দিন-পাঁচেক সেই দুর্গে রইল। প্রচুর খাওয়া-দাওয়া আর বিশ্রামে শরীরটা ভালো হয়ে উঠল। হেনরীকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফ্রান্সিস একদিন তেকরুর বন্দরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

* * *

সন্ধ্যে নাগাদ তেকরুর বন্দরে পেঁছিল। উঠল সেই পুরনো সরাইখানাতেই।

পরের দিন থেকে ফ্রান্সিস জাহাজঘাটায় গিয়ে খোঁজ করতে লাগল—ওর দেশের দিকে কোন জাহাজই পেল না। এদিকে সঞ্চিত পর্তুগীজ মুদ্রাও ফুরিয়ে আসছে।

অবশেষে একটা জাহাজ পাওয়া গেল। যাবে ফ্রান্সের ক্যালে বন্দরে। ফ্রান্সিস সেই জাহাজেই উঠল। ক্যাপ্টেনকে সব কথাই বলল। শুধু হীরের পাহাড়ের কথাটা বলল না। ক্যাপ্টেন সব শুনে তাকে নিয়ে যেতে রাজী হল।

ফ্রান্সিস বলল—আমাকে কিন্তু খালাসীর কাজ দিতে হবে।

—বেশ, তাই করবেন। ক্যাপ্টেন বলল।

তেকরুর বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ল দুপুরবেলা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। চারিদিকে কেমন একটা মেটে আলো ছড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস ডেক-এ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল তেকরুর বন্দরের দিকে। বার-বার হ্যারি ও মকবুলের কথা মনে পড়তে লাগল। চোখে জল এল ফ্রান্সিসের। দু'জন বন্ধুকে আফ্রিকার মাটিতে রেখে তাকে ফিরতে হচ্ছে দেশে। ফ্রান্সিস অপসৃয়মাণ তেকরুর বন্দরের দিকে তাকিয়ে মনে-মনে বলল—আমি আবার আসবো। যে হীরের সন্ধানে বেরিয়ে আমি আমার প্রিয় বন্ধুদের হারিয়েছি, সেই হীরে আমাকে পেতেই হবে। যতদিন পর্যন্ত না সেই হীরে পাই, ততদিন আমি আসবো।

একটু পরে তেকরুর বন্দরের চারিদিকের বনজঙ্গল সব মুছে গেল। জাহাজ চলে এল মধ্য সমুদ্রে।

দিন যায়, রাত যায়। জাহাজ চলেছে। ইতালীর কয়েকটা বন্দর ছুঁয়ে এবার চলেছে স্পেন-এর দিকে। ফ্রান্সিস জাহাজটার খালাসীর কাজ করে, আর দেশে যাবার জাহাজ ভাড়া জমায়। স্পেন হয়ে জাহাজ চলল এবার ফ্রান্সের ক্যালে বন্দরের অভিমুখে। ফ্রান্সিস একা-একা থাকতেই ভালোবাসে। জাহাজের কারো সঙ্গে বন্ধুত্বও হয় নি। জাহাজের লোকেরা তাকে 'দাম্ভিক' বলেই ধরে নিয়েছে। ফ্রান্সিস নিজের ভাবনা নিয়েই ব্যস্ত। কাজেই কে কী ভাবল, এই নিয়ে মাথা ঘামায় নি। জাহাজে দেশের কাউকে পায়নি। এজন্যে মনটা যেন আরো খারাপ হয়ে গেছে। কারো সঙ্গেই সে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে পারল না।

একদিন সকালের দিকে ক্যালে বন্দরে এসে জাহাজটা ভিড়ল। ফ্রান্সিস ক্যাপ্টেনকে অনেক ধন্যবাদ দিল। তারপর জাহাজ থেকে জাহাজঘাটায় এসে দাঁড়াল।



ফ্রান্সিস ডেক-এ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল তেকরুর বন্দরের দিকে।

দিনটা সেদিন পরিষ্কার। উজ্জ্বল রোদে চারদিক ঝলমল করছে। ক্যালে বন্দরে অনেক জাহাজের ভীড়। ফ্রান্সিস এক জাহাজ থেকে আর এক জাহাজে খোঁজ করতে লাগল—নরওয়েগামী কোন জাহাজ পাওয়া যায় কিনা। পাওয়া গেল একটা জাহাজ। জাহাজটা ছোট। জাহাজটার কাজ গরু-ঘোড়া চালান দেওয়া। তাই খড়ে-গোবরে জাহাজটা নোংরা হয়ে আছে। কিন্তু উপায় কি? জাহাজটা জার্মানীর কয়েকটা বন্দরে থেমে-থেমে ভাইকিং রাজ্যের রাজধানী রিবকায় যাবে। সরাসরি রিবকা যাচ্ছে, এমন জাহাজ কবে পাওয়া যাবে, কে জানে? তাই ফ্রান্সিস এই ছোট্ট জাহাজটাতেই মালপত্র নিয়ে এসে উঠল। জমানো টাকা দিয়ে ভাড়া মিটিয়ে দিল। একটা রাত জাহাজেই অপেক্ষা করতে হল। পরের দিন ভোরবেলা জাহাজ ছাড়ল।

দিন পনেরো পরে জাহাজটা একদিন সন্ধ্যেবেলা রিবকা বন্দরে এসে পেঁছাল। ফ্রান্সিসের আর তর সইছিল না, জাহাজ থেকে পাঠাতন ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে বন্দরে নেমে এল। কতদিন পরে আবার ফিরে এসেছে তার আবাল্য পরিচিত শহরে।

ফ্রান্সিস আনন্দে প্রায় ছুটে এসে দাঁড়াল শহরের রাস্তায়।

একটা গাড়ি ভাড়া করল। গাড়ি চলল শহরের রাস্তা ধরে। ফ্রান্সিস একবার এই জানালা, একবার অন্য জানালা দিয়ে দেখতে লাগল শহরের পরিচিত দৃশ্য—বাড়ি ঘর-দোকানপাট। তখন রাত হয়েছে। এখানে-ওখানে আলো জ্বলে উঠেছে।

একসময় গাড়িটা ওদের বাড়ির গেট-এর কাছে এসে থামল। ফ্রান্সিস সামান্য মালপত্র যা ছিল, তাই নিয়ে গাড়ি থেকে নামল। ভাড়া মিটিয়ে লতা গাছে ঘেরা গেট-এ এসে দাঁড়াল। গেট-এর লতাগাছটা সারা দেয়াল ঘিরে ফেলেছে। গেট-এ ঝোলানো কড়াটা জোরে-জোরে নাড়ল। বাগানের মালীটা এল। গেট-এর আলোতে সে ফ্রান্সিসকে চিনতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, কাকে চাই ?

ফ্রান্সিস হাসল। বলল—আরে আমি ফ্রান্সিস। দরজা খোল।

এতক্ষণে ফ্রান্সিসকে চিনতে পেরে মালীটা ফোকলা দাঁতে একবার হাসল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ফ্রান্সিসের মালপত্র হাতে নিল। ফ্রান্সিস ঢুকলে মালপত্র নিয়ে মালীটা তার পিছু-পিছু আসতে লাগল।

মা বাইরের ঘরেই বসেছিল। কোলের ওপর একটা ছিটকাপড়ের টুকরো। বোধহয় কিছু সেলাই-ফোঁড়াই করছিল। মালীটাকে বারণ করবার আগেই ও ডেকে বসল—কর্তা মা। মা সেলাই থেকে মুখ তুলে তাকাল, মা'র মুখটা বড় শীর্ণ দেখাচ্ছে, তাতে বয়সের বলিরেখা। মা একটুক্ষণ ফ্রান্সিসের দিকে চেয়ে রইল। ফ্রান্সিসের চোখ দু'টো ছলছল করে উঠল। ফ্রান্সিস গভীর কণ্ঠে ডাকল—মা।

ফ্রান্সিস ফিরে এসেছে। মা তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠতে লাগল! ফ্রান্সিস তার আগেই মাকে জড়িয়ে ধরে বলল—তুমি বসো মা।

মা ফ্রান্সিসের মুখে মাথায় হাত বুলোতে লাগল। ধরা গলায় বলল—হ্যাঁরে পাগল, তুই কবে সুস্থির হবি বলতে পারিস ?

ফ্রান্সিস সে কথার জবাব না দিয়ে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলতে লাগল—মা—মাগো—আমার মা।

মা এবার কেঁদে ফেলল। ফ্রান্সিস বলল—আমি তো ফিরে এসেছি মা—তবে আর তুমি কাঁদছো কেন মা ?

একটু পরে মা চোখ মুছতে-মুছতে জিজ্ঞেস করল—তোর বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

—না, বাবা কোথায় ?

—লাইব্রেরী ঘরে। আজকে আর দেখা করিস না, তোকে দেখলেই রাগারাগি শুরু করবে। আজকে চুপচাপ খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়গে। কাল সকালে বলা যাবে'খন।

কিন্তু ফ্রান্সিস ফিরে এসেছে, এমন একটা আনন্দ সংবাদ মালীটা চেপে রাখতে পারল না। ফ্রান্সিসের বাবাকে গিয়ে বলল।

ফ্রান্সিস সবে খেতে বসেছে, এমন সময় বাবা এসে হাজির। ফ্রান্সিসকে একটা কথাও জিজ্ঞেস করলেন না। মাকে বললেন—কুলাঙ্গারটা ফিরে এসেছে, কই আমাকে তো বলোনি!

—ম্—মানে ভাবছিলাম—মা আমতা-আমতা করতে লাগল।

—তোমার আদরেই তো ছেলেটা উচ্ছন্নে গেল—বাবা বললেন।

—ঠিক আছে, আগে ওকে খেতে দাও—কতোদিন ভালো করে খায়নি, কে জানে!

বাবা সে কথার কোন জবাব না দিয়ে ফ্রান্সিসের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন—জাহাজ থেকে কোথায় পালিয়ে গিয়েছিলে ?

—ইয়ে—আফ্রিকা।

—সেখানে আবার কিসের জন্য ?

—জানো বাবা—একটা মস্ত বড় হীরে—

বাবা হাত নাড়লেন—বুঝেছি—বুঝেছি, এইজন্যেই তুমি রাজামশাইয়ের কাছে জাহাজ চেয়েছিল।

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা—তোমার একবারও কি আমাদের কথা মনে পড়ে না ?

বাবার গলা বুজে আসে। তাঁর মন কাঁদছে, কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ করতে রাজী নন। ফ্রান্সিস সে কথার কোন জবাব না দিয়ে মাথা গুঁজে বসে রইল।

—অনেক হয়েছে—এবার ওকে খেতে দাও—মা বলল।

—হুঁ—বলে বাবা চলে গেলেন। বেরিয়ে যাবার সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শুধু বললেন—তোমার এখন বাড়ী থেকে বেরুনো বন্ধ !

সত্যি কয়েদখানায় থাকার মত অবস্থা করে তোলা হল। দু'জনকে মোতায়েন করা হল। একজন বাড়ীর ভিতরে, অন্যজন গেট-এ। ফ্রান্সিস ভেবে দেখল—এখন চুপচাপ থাকাই ভালো।



ফ্রান্সিসসা গাছটা বেয়ে নামতে লাগল।

এইভাবেই কাটল কয়েক মাস। বাড়ীর মধ্যেই বন্ধ হয়ে রইল ফ্রান্সিস। রাজামশাই ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন। সেই দিনটিতেই শুধু বাইরে যাবার অনুমতি মিলেছিল। অবশ্য সঙ্গে একজন সৈনিক ছিল। আর একটা অনুমতি অনেক কষ্টে আদায় করেছিল ফ্রান্সিস। রাজার সৈন্যদের তাঁবুতে গিয়ে ওদের সঙ্গে তীর ছোঁড়ার অভ্যাস করা। এই তীর ছোঁড়া অভ্যাস করার সময়ও ফ্রান্সিসের সঙ্গে একজন সৈন্য পাহারা থাকত। ফ্রান্সিস প্রতিদিন খুব মনোযোগ দিয়ে তীর ছোঁড়া অভ্যাস করতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রান্সিস সেরা তীরন্দাজ হয়ে উঠল।

মাস কয়েক পরে ছেলের সুমতি হয়েছে দেখে বাবা ভেতর বাড়ির সৈন্যটিকে সরিয়ে নিলেন। এই কাজের ভার পড়ল ছোট্ট ভাইটির ওপর। কিন্তু গেট-এর সৈন্যটি বহাল রইল। এবার ফ্রান্সিস তৎপর হলো। শুরু হলো, একটু রাত হলেই বাড়ি থেকে পালানো। রাত্রে ঘুমুতে যাবার আগে মা ছেলেকে একবার দেখে যায় ঘুমুলো কিনা। ফ্রান্সিস তখন নিঃসাড় শুয়ে থাকে। মা নিশ্চিত মনে চলে গেলেই জানালার পাশে লতা-গাছটা ধরে নীচে নামে। তারপর দেওয়াল ডিঙিয়ে রাস্তায়।

বন্ধুরা নির্দিষ্ট পোড়ো বাড়িটায় এসে জমায়েত হয়। জোর মতলব চলে। এবারের লক্ষ্য হীরের পাহাড় ! হ্যারির জন্যে সবাই দুঃখ করে। ফ্রান্সিস এই উদাহরণটি তুলেই

বলল—ভাইসব—হ্যারি যেভাবে জীবন দিয়েছে, তেমনি একইভাবে আমাদেরও জীবন যেতে পারে। তাই বলছি—যারা নির্ভীক, যে কোন বিপদের মোকাবিলা করতে রাজী আছে—শুধু তারাই এগিয়ে এসো। অনেক বাছাইয়ের পর প্রায় চল্লিশজনকে পাওয়া গেল। এর মধ্যে দশজনকে ফ্রান্সিস নির্বাচন করল—এরাই যাবে হীরের পাহাড়ে। বাকীরা তেকরুর বন্দরে জাহাজেই থাকবে।

এবার শুরু হলো যাত্রার আয়োজন। প্রথমেই ছুতোর মিস্ত্রী ডেকে একটা খোলাঘোড়ায় টানা গাড়ি তৈরী করানো শুরু হল। ঘোড়ায় টানা গাড়িটা শেষ হতে প্রায় মাসখানেক লাগল। গাড়িটা চালানোর জন্যে চারটে ঘোড়াও কেনা হল। দলের মধ্যে রিঙ্গোই ছিল ওস্তাদ গাড়িচালক। সে দু'বেলা রিবকার রাজপথে গাড়িটা চালিয়ে অভ্যেস করে নিতে লাগল। ফ্রান্সিস অনেক কষ্টে বাবার কাছ থেকে রিঙ্গোর সঙ্গে গাড়ি চালানোর শেখার অনুমতি আদায় করল। রাজপথে গাড়ি চালায় দু'জনে। রাস্তার লোকেরা দেখে, কিন্তু এতবড় একটা খোলা ছাদের গাড়ি তৈরি করার কোন কারণ খুঁজে পায় না। গাড়ি আর ঘোড়াগুলো রাখা হয় পোড়ো বাড়িটাতে।

এবার জাহাজের বন্দোবস্ত। রাজামশাইয়ের কাছে চাইলে হয়তো একটা জাহাজ পাওয়া যেত। কিন্তু ফ্রান্সিসের বাবা ছেলেকে আবার সমুদ্রযাত্রায় বেরুতে দিতে ঘোরতর আপত্তি করবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই রাজামশাইয়ের ইচ্ছা থাকলেও উনি জাহাজ দিতে পারবেন না। সুতরাং একমাত্র উপায় জাহাজ চুরি করা। পোড়ো বাড়িতে শেষ জমায়েত-এর রাত্রে জাহাজ চুরি করে চালানোর নির্দিষ্ট দিনক্ষণও স্থির হয়ে গেল।

* * *

সেদিন গভীর রাত। জাহাজঘাটায় রাজার সৈন্যরা জাহাজ পাহারা দিচ্ছে। এখানে-ওখানে মশাল জ্বলছে। মশালের কাঁপা-কাঁপা আলোয় অন্ধকার একেবারে দূর হয়নি। জায়গায়-জায়গায় অন্ধকার বেশ গাঢ়। তেমনি এক অন্ধকার কোণা থেকে একদল লোক একটা জাহাজে উঠে এল। তারপর একে-একে পাহারাদার সৈন্যদের কাবু করে ফেলল। হাত-মুখ বেঁধে তাদের কেবিন ঘরে আটকে রাখা হল। লোকগুলো ধরাধরি করে একটা গাড়ি জাহাজে তুলল। তারপর পাঠাতনের ওপর দিয়ে চারটে ঘোড়াকে সন্তর্পণে হাঁটিয়ে এনে জাহাজে তোলা হয়। ঠিক তখন জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে দু'টো খড়ের গাদায় আগুন লাগানো হল। বলা বাহুল্য, এই সবই ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুদের কাজ। দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আগুনের শিখা অনেক উঁচুতে উঠল। জাহাজের খালাসীরা আর পাহারাদার সৈন্যরা ছুটোছুটি করে জল এনে খড়ের গাদায় ঢালতে লাগল। জাহাজ-ঘাটায় অপেক্ষমান জাহাজগুলোতে পাছে আগুন লেগে যায়, এই আশঙ্কায় অনেক জাহাজের নোঙর তুলে দূরে গভীর সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া হল। সেইখানে জাহাজগুলো অপেক্ষা করতে লাগল, আগুন একেবারে নিভে যাওয়ার জন্যে। শুধু একটি জাহাজ অপেক্ষা করল না। লোকলস্কর নিয়ে জাহাজটা পাল তুলে জল কেটে ছুটে চলল। এটা ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুদেরই কাণ্ড। জাহাজঘাটায় আগুন নিভল। গভীর সমুদ্র থেকে জাহাজ-গুলো জাহাজঘাটায় ফিরে এল। হিসেব করে দেখা গেল, ভাইকিং রাজার একটা জাহাজ কম পড়েছে। জাহাজটা যে চুরি করে একদল লোক পালিয়ে গেছে, এ বিষয়ে কোন

সন্দেহ রইল না। রাজার কাছে খবর গেল। কিন্তু রাজামশাই এই নিয়ে বেশী উচ্চবাচ্য করলেন না। তিনি বুঝলেন, এ নিশ্চয়ই ফ্রান্সিসেরই কাজ। কিন্তু ফ্রান্সিসের বাবা ব্যস্ত হলেন। ভোরবেলাই শুনলেন তিনি, ফ্রান্সিসকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সঙ্গে-সঙ্গে রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। রাজামশাই সব শুনে বললে—ক'টা দিন যাক—ওরা যদি তার মধ্যে না ফেরে, তবে আমরা ওদের খোঁজে বেরুবো।

ফ্রান্সিসের বাবা অগত্যা রাজার কথাই মেনে নিলেন।

* * *

দিন যায়, রাত যায়। জাহাজ চলছে, ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুদের নিয়ে। হাওয়ার তোড়ে পালগুলো ফুলে ওঠে। দাঁড়িদের তখন কোন কাজ থাকে না। তারা ডেক-এর ওপর গোল হয়ে বসে ছক্কা-পাঞ্জা খেলে। আর একজন তখন ডেক ধোয়া-মোছা করে পালের দড়িদড়া ঠিক করে। এইভাবে দিনরাত জাহাজটা ভেসে চলে।

দু'বার ভীষণ ঝড়ের পাল্লায় পড়তে হয়েছিল। প্রথম ঝড়টি জাহাজের কোন ক্ষতি করতে পারে নি। কিন্তু দ্বিতীয় ঝড়টির সময় পাল নামাতে একটু দেরী হয়েছিল। দু'টো পাল ফেঁসে গিয়েছিল। পাল দু'টো আবার সেলাই করা হল। পালের দড়ি-দড়া কাঠ সব পালটানো হলো।

পালে হাওয়া লাগলে সবাই দাঁড় টানার একঘেঁয়ে কাজ থেকে ছুটি পায়। গান গেয়ে, ছক্কাপাঞ্জা খেলে, তাস খেলে সময় কাটায়। শুধু অবসর নেই ফ্রান্সিসের। সে একা-একা ডেকের ওপর পায়চারী করে। মাঝে-মাঝে ছাদখোলা গাড়িটা দেখে। কখনও বা শূন্যদৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর ভাবনার শেষ নেই। তেকরুর বন্দরে পৌঁছবার পর কী-কী করতে হবে—মোরান উপজাতিদের এলাকা দিয়ে না গিয়ে উত্তর দিক থেকে কী করে ওঙ্গালির বাজারে যাওয়া যাবে। এতগুলো লোকের নিরাপত্তার চিন্তা তার মাথায়। এটা তাকে পালন করতেই হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন রয়েছে, তেমনি জন্তু-জানোয়ারের দিক থেকেও বিপদ কম নেই। এইসব বিপদের মধ্যে দিয়ে হীরের পাহাড়ে যেতে হবে, আবার ফিরেও আসতে হবে। লোভার্ত মানুষের সংখ্যাও পৃথিবীতে কম নেই। বিপদ সেইদিক থেকেও কিছু কম নয়। কাজেই সব সময় সজাগ থাকতে হবে। নিশ্চিন্ত হবার সময় এখনও আসেনি।

দীর্ঘদিন মাটির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কেউ-কেউ অসহিষ্ণুস্বরে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে, কবে জাহাজটা তেকরুর বন্দরে পৌঁছোবে। কারো পক্ষেই সঠিক কতদিন লাগবে, বলা শক্ত। তাই অনেকেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। ফ্রান্সিসের সোনার ঘণ্টা আনতে যাবার সময় জাহাজের বন্ধুদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা ছিল। তাই এবার সে স্পষ্টই বলে দিয়েছে—অধৈর্য হলে চলবে না! সবেতেই তার নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করতে হবে। কোনোরকম বিশৃংখলা দেখা গেলে, সে যে কোন বন্দরে নেমে যাবে। সেখান থেকে ফিরে আবার নতুন লোকজন নিয়ে আসবে। সোনার ঘণ্টা আনতে যারা তার সঙ্গে গিয়েছিল, তারা অনেকেই এই অভিযানে তার সঙ্গী হয়েছে। তাদের ওপরেই ফ্রান্সিসকে বেশী নির্ভর করতে হচ্ছে। ফ্রান্সিসের ওপর তাদের অগাধ বিশ্বাস। মুশকিল হয়েছে নতুনদের নিয়ে। তারা বেশ অধৈর্য হয়ে উঠেছে। এ খবর ফ্রান্সিসের কানেও

ওঠে। সে ডেক-এ সবাইকে নিয়ে সভা মতো করে। সেখানে সে বলে—ভাইসব, হীরের পাহাড়ের হীরে ছেলের হাতের মোয়া নয় যে, সেই আগ বাড়িয়ে হাত তুলে দেবে। দস্তুরমত মরণপণ সংগ্রাম করে, সেটা সংগ্রহ করতে হবে। কাজেই আমাদের অধৈর্য হলে চলবে না। তেকরুর বন্দরে পৌঁছুতে আমাদের আর বেশীদিন লাগবে না। তারপরেও যে কাজ আছে, তা বেশ কঠিন। দেশে ফিরে যাবার কথা, ঘরে নিশ্চিত জীবনের কথা, আমাদের ভুলে যেতে হবে। এখন চাই অটল সাহস, শক্তি আর বুদ্ধি। সবাই শান্ত হয়ে ফ্রান্সিসের কথা শোনে। এই অভিযানের গুরুত্ব মনে করে অসহিষ্ণু বন্ধুরা শান্ত হয়। যে যার নিজে-নিজের কাজে লেগে পড়ে।

একদিন সকালে জাহাজটা তেকরুর বন্দরে এসে পৌঁছলো। দীর্ঘদিন পরে মাটির দেখা পেয়ে সবাই উল্লাসিত হল। দল বেঁধে নেমে পড়ল জাহাজঘাটায়। চিৎকার করে কথা বলতে লাগল, হৈ-হল্লা করতে লাগল, গান গাইতে লাগল, গাড়িটা আর ঘোড়া চারটেকে জাহাজ থেকে নামালো হলো। রিঙ্গো দ্রুতহাতে গাড়িটায় ঘোড়া জুড়ল। গাড়িটায় তোলা হলো বেশ কয়েকদিনের খাবার-দাবার, জল আর কয়েকটা লম্বা কাছি। যে দশজন সঙ্গে যাবে বলে ফ্রান্সিস আগে স্থির করেছিল, তাদের নিয়ে ফ্রান্সিস গাড়িতে উঠে বসল।

দুপুর নাগাদ ওদের গাড়িটা পর্তুগীজ দুর্গটার সামনে এসে হাজির হলো। দুর্গে তখন খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ হবার আয়োজন চলেছে। একজন সৈনিক এসে দুর্গাধ্যক্ষ হেনরীকে ফ্রান্সিসের কথা জানাল। হেনরী দুর্গের ভিতরে আসতে বলে দিল।

সেই রাতটা ফ্রান্সিসরা দুর্গটাতেই রইল। রাত্রে খাবার টেবিলে হেনরীর সঙ্গে দেখা হল। কথায়-কথায় হেনরী একটু বিস্ময়মিশ্রিত সুরে ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞেস করল—কার্পেট বিক্রী করতে এত লোকজন নিয়ে এসেছেন কেন?

ফ্রান্সিস কী বলবে, বুঝে উঠতে পারতে না পেরে আমতা-আমতা করে বললো—ইয়ে হয়েছে—মানে কালকে এখান থেকে বেরিয়ে আমরা এক-একজন এক-একদিকে যাবো। কার্পেটের চাহিদা কেমন বুঝে নিতে।

—কিন্তু শুনলাম, আপনাদের সঙ্গে নাকি কার্পেটও নেই!

—কার্পেট আছে তেকরুর বন্দরে—জাহাজে! এখানকার চাহিদা বুঝেই আমরা কার্পেট নিয়ে আসবো।

হেনরী আর কোন কথা জিজ্ঞেস করল না। তবে ফ্রান্সিসের উত্তরগুলো তার যে মনমতো হয়নি, এটা বোঝা গেল। তারপর এটা-ওটা নিয়ে কথাবার্তা চলল। ফ্রান্সিস একসময় জিজ্ঞেস করল—আমাদের একজন গাইড দিতে পারেন?

—গতবার আপনাদের যে গাইড ছিল, তাকে পেতে পারেন।

—তাহ'লে তো খুবই ভালো হয়। কিন্তু কালকে ভোরবেলা ওকে খবর দিয়ে আনা কি সম্ভব?

—কিছু ভাববেন না। আমি এই রাত্রেই মাসাইদের গ্রামে লোক পাঠাচ্ছি। কাল সকালেই গাইড পেয়ে যাবেন।

—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

তখন সবে ভোর হয়েছে, গাইড এসে হাজির। অগত্যা ফ্রান্সিসকে বিছানা ছেড়ে

উঠতে হল। অনেক কষ্টে ফ্রান্সিস গাইডকে বোঝাল যে, ওরা উত্তর দিক দিয়ে ওঙ্গালির বাজারে যেতে চায়। গাইড মাথা ঝাঁকালো, অর্থাৎ সে ফ্রান্সিসের কথা বুঝতে পেরেছে।

সকালবেলা ঘোড়ার ডাকে, গাড়ির চাকার ক্যাচ্ কোঁচ শব্দে লোকজনের কথাবার্তায় দুর্গপ্রাঙ্গণ মুখর হয়ে উঠল। সকলে কিছু খেয়ে নিল। তারপর গাড়িতে গোছ-গাছ করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

কিছুদূর বনের মধ্যে দিয়ে যেতে হল। তারপরেই শুরু হল দিগন্তবিস্তৃত মেঠো জমি। গাইড জানাল—এইসব জায়গায় সিংহ থাকে, কাজেই সাবধান। কপাল ভালো সিংহের সামনা-সামনি পড়তে হলো না। দূরে একটা সিংহীকে দেখা গেল। একটা গাছের চারপাশে চক্কর দিচ্ছে। গাইড বোঝাল, ওখানে সিংহীটার কাচ্চাবাচ্চা আছে। তাই সিংহীটা ঐ জায়গা ছেড়ে নড়ছে না। গাইডের একটা ব্যবহার ফ্রান্সিসের কাছে রহস্যময় লাগল। যেখান দিয়ে ওরা যাচ্ছিল—ধারে কাছে কোন গাছ থাকলে সেটার ডাল কেটে দিচ্ছিল। গাইডকে কারণটা জিজ্ঞেস করল ফ্রান্সিস। গাইড বোঝাল যে, সিংহের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে এসব তুকতাক করছে।

গাড়ি চলছে, চলার বিরাম নেই। ফ্রান্সিসরা চলেছে তো চলেছেই। গাইড বোঝাল—মোরান উপজাতিদের এলাকার বাইরে দিয়ে যেতে হচ্ছে, তাই ঘুরাপথ নিতে হয়েছে—এতে একটা সুবিধে হয়েছে—ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ করে যেতে হচ্ছে না, ঘোড়ার গাড়ি সহজেই যেতে পারছে।

সেদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। শুনল—ঘোড়াগুলো অস্বস্তিতে মাটিতে পা ঠুকছে, মাঝে-মাঝে ডেকে উঠছে। ফ্রান্সিস উঠে বসল, নিশ্চয়ই হায়না এসেছে। তীর-ধনুক নিয়ে ফ্রান্সিস তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। ঘোড়াগুলো যে গাছটায় বাঁধা আছে, সেইদিকে পায়ে-পায়ে এগোলো। কিন্তু গাছটা পর্যন্ত আর যাওয়া হলো না। ও কি? গাছটার আড়ালে অল্প-অল্প অন্ধকারে দু'টো চোখ জ্বল-জ্বল করছে। ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল।

সিংহ! দ্রুতপায়ে তাঁবুতে ফিরে এল। আরো কয়েকজনকে সঙ্গে চাই। ইতিমধ্যে ঘোড়ার ডাকে দু'-একজনের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ফ্রান্সিসের ধাক্কায় তারা উঠে বসল। ফ্রান্সিস ফিসফিস করে বলল—সিংহ এসেছে, শীগ্‌গির তৈরী হয়ে এসো। কথা ক'টা বলেই তাঁবুর বাইরে চলে গেল। বাইরে আগুনের যে ধুনি জ্বালানো হয়েছিল, সেটা প্রায় নিভে গেছে, আকাশের চাঁদও ক্ষীণ। একটা খুব ম্লান আলো চারিদিকে ছড়ানো। এতে সিংহটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, শুধু চোখ দু'টো আবছা অন্ধকারে জ্বলে উঠছে।

ফ্রান্সিস হাঁটু গেড়ে বসল। তখনই কয়েকজন তীর-ধনুক নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস ফিসফিস্ করে বলল—সিংহটা সামনের গাছটার পেছনেই রয়েছে। তোমরা দু' দলে ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে যাও, আমি প্রথমে ধুনীর পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মেরেই তীর চালাবো। তোমরাও লক্ষ্য স্থির করে তীর চালাবে।

যারা তীর-ধনুক নিয়ে এসেছিল, তারা দু'দলে ভাগ হয়ে দু-পাশে চলে গেল। ঘোড়াগুলো আবার মাটিতে পা ঠুকতে লাগল, আর দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার জন্য দড়িতে টান দিতে লাগল। ফ্রান্সিস আর দেরী করল না। ধুনী থেকে একটা আধপোড়া কাঠ

ছুঁড়ে মারল গাছটার দিকে। কাঠটা মাটিতে পড়তেই কতকগুলো স্ফুলিঙ্গ উড়ল। ফ্রান্সিস অন্ধকারে চোখ দুটোর দিকে লক্ষ্য রেখে তীর ছুঁড়ল। তীরটা কোথায় গিয়ে বিঁধল বোঝা গেল না। কিন্তু সিংহটা প্রচণ্ড গর্জন করে লাফিয়ে এসে পড়ল ধুনীটার কাছে। এবার সিংহটার অস্পষ্ট শরীরের রেখা দেখা গেল। সিংহটা আবার গর্জন করে উঠল। বোধহয় ফ্রান্সিসের বন্ধুরা কেউ তীর ছুঁড়েছে।

সিংহটা গর্-গর্ করে উঠেই লাফ দিয়ে পড়ল গাছটার কাছে। ঘোড়াগুলো জোরে ডেকে উঠল, আর দড়ির বাঁধন ছিড়ে ফেলার জন্যে চাপাচাপি শুরু করে দিল। তখনই ফ্রান্সিস তার এক সঙ্গীর ভয়ার্ত চীৎকার শুনতে পেল। সিংহটা কিন্তু আর দাঁড়াল না। চাঁদের ক্ষীণ আলোয় দেখা গেল, সিংহটা ছুটে চলে যাচ্ছে। এই রাত্রিবেলা সিংহের পিছু ধাওয়া করা বোকামি। ফ্রান্সিস ছুটে সঙ্গীটির কাছে গেল। দেখা গেল আঘাতটা মারাত্মক নয়। সিংহের থাবার নখে হাত ছড়ে গেছে। ওরা সঙ্গে যে ওষুধপত্র এনেছিল, তাই দিয়ে হাতটা বেঁধে দিল। সঙ্গীটি প্রাণে বেঁচেছে, এতেই তারা খুশী হল।

সকালে কিছু খাওয়া-দাওয়া করে ফ্রান্সিস দু'জন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সিংহটার খোঁজে বেরুলো। গাছের তলাটায় দেখল রক্তের গাঢ় দাগ। বোঝা গেল, সিংহটা বেশ আহত হয়েছে। ঘাসের ওপর পাতার ওপর রক্তের দাগ দেখে-দেখে ফ্রান্সিসরা আহত সিংহটার হদিস খুঁজতে বেরুলো। রক্তের দাগ দেখে-দেখে অনেকটা যাবার পর কয়েকটাপাথরের আড়ালে দাগগুলো শেষ হয়েছে দেখা গেল। ফ্রান্সিস ইঙ্গিতে সঙ্গের দু'জনকে দু'পাশ দিয়ে যেতে বলল। নিজে আস্তে-আস্তে খুব সন্তর্পণে পাথরের ওপাশে চলে এল। দেখল ঠিক পাথরের আড়ালেই সিংহটা শুয়ে খুব মৃদুস্বরে গর্ গর্ করছে। অন্য পাথরগুলোর মাথায় দুই সঙ্গীর মুখ দেখতে পেল ফ্রান্সিস। ইশারায় তাদের তীর চালাতে বলে নিজেও সিংহটার বুক লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল। সিংহটা গর্জন করে লাফিয়ে উঠল। ততক্ষণে আরো কয়েকটা তীর এসে লাগল। সিংহটা নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়ল। ওর গর্-গর্ ডাকও একসময় বন্ধ হয়ে গেল।



নিজেও সিংহের বুক লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল।

সিংহটা মারা গেছে কিনা পরীক্ষা করবার জন্য ফ্রান্সিস কয়েকটা পাথরের নুড়ি ছুঁড়ে মারল। কিন্তু সিংহটা নড়ল না। এবার ফ্রান্সিস সাহসে ভর করে পাথরের আড়াল থেকে এগিয়ে এসে সিংহটার লেজ ধরে পা ধরে টানল। দেখল, ওর তীরটা সিংহটার হৃৎপিণ্ড ভেদ করেছে। এবার ফ্রান্সিস নিশ্চিত হলো যে, সিংহটা মারা গেছে। ফ্রান্সিস তার সঙ্গীদের ডাকল। দু'জন সঙ্গী মহানন্দে চীৎকার করতে লাগল। সিংহটার চারপাশে

ঘুরে-ঘুরে নাচতে লাগল। তাঁবুতে ফিরে এই সংবাদ দিতে সবাই হই-হই করে উঠল। তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হল। মাঠের বিস্তৃত জমি ছেড়ে এবার ছাড়া-ছাড়া গাছপালার বন-জঙ্গল শুরু হল।

তিনদিন পর একদিন সন্ধ্যেবেলা ফ্রান্সিসরা ওঙ্গালির বাজারে এসে পৌঁছল। নামেই বাজার। কয়েকটা চারদিক খোলা খড়ের চাল দেওয়া ঘর। এখানেই বোধহয় বাজার বসে এখন সন্ধ্যেবেলা দু-চারটে দোকানদার আনাজ-পত্র নিয়ে বসে আছে। কিন্তু লোকজন এখন এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাইডটি জানাল, সিংহের ভয়ে সন্ধ্যের পর এখানে কোন লোকজন থাকে না।

একটু রাত হলে হাটের একটা ঘরে তারা আশ্রয় নিল। রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকালবেলাই আবার পথ শুরু হল। ফ্রান্সিস গাইডটিকে বোঝাল বোঝাল ওরা কোথায় যেতে চায়। উত্তর দিকটা দেখিয়ে বলল—ঐদিকে একটা পাহাড়, তা আমরা সেখানেই যাবো। তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো। গাইডটি রাজী হল।

সেই দিনটি পথেই কাটল। পরদিন দুপরবেলা ফ্রান্সিসরা একটা পাহাড় দেখতে পেল, পাহাড়টার কাছাকাছি এসে দেখল পাহাড়টা খুব উঁচু নয়। গাছপালাও খুব বেশী নেই। মকবুল ঠিকই বলেছিল—পাহাড়টার একপাশ খাড়া উঠে গেছে। অন্য দিকটা এবড়ো-খেবড়ো পাথরের ঢিবি রয়েছে। এইদিক দিয়েই মকবুল আর বুঙ্গা বোধহয় পাহাড়ে উঠেছিল। ধ্বস নামায় নিশ্চয়ই গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। সেই মুখটা খুঁজে বের করতে হবে।



ফ্রান্সিস কোমরে তরোয়ালটা গুজে কাছি ধরে ঝুলে পড়ল।

ঘুরে-ফিরে পাহাড়টা দেখতে-দেখতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। সেই রাতটা ওরা পাহাড়টার নীচে কাটাল। পরদিন সকালবেলা শুরু হলো পাহাড়ে ওঠা। রিঙ্গো রইল, গাড়ি-ঘোড়ার পাহারায়। বাকী সবাই পাহাড়ে উঠতে লাগল এবড়ো-খেবড়ো পাথরে পা রেখে একসময় ওরা পাহাড়ের মাথায় উঠে এল। সেখানে মস্তবড় একটা পাথরের সঙ্গে কাছিটা বেঁধে পাহাড়ের খাড়াই দিকটা ঝুলিয়ে ছিল। ফ্রান্সিস বন্ধুদের বলল—আমিই প্রথমে নামছি। যদি গুহা খুঁজে পাই আমি, দু'বার কাছিটায় হ্যাঁচ্‌কা টান দেব। তখন তোমরা বেল্‌চা-গাঁইতি নিয়ে নেমে আসবে।

ফ্রান্সিস কোমরে তরোয়ালটা গুঁজে কাছিটা ধরে ঝুলে পড়ল। তারপর খাড়াই পাথরের এখানে-ওখানে পা রেখে-রেখে অনেকটা নেমে এল। তখনই দেখল, কয়েকটা গাছ আর বুনো ঝোপের আড়ালে একটা গুহার মুখ। কিন্তু মুখটা ধুলো-বালি-পাথরে বন্ধ

হয়ে গেছে। মুখটা বন্ধ হয়ে গেলেও দু'তিনজন লোক দাঁড়াবারমত জায়গা সেখানে রয়েছে। ফ্রান্সিস গাছের ডালে পা রেখে গুহার মুখটাতে এসে দাঁড়াল, তারপর কাছিটা ধরে দু'টো হ্যাঁচ্‌কা টান দিল।

একটু পরেই ফ্রান্সিসের দু'জন সঙ্গী কাছি ধরে-ধরে নেমে এল। তাদের হাতে ছিল বেল্‌চা আর গাঁইতি। সংকীর্ণ জায়গাটায় তিনজন দাঁড়াল। তারপর একজন গাঁইতি চালিয়ে ধুলোবালি, পাথর আলগা করে দিতে লাগল। অন্যজন বেল্‌চা দিয়ে ধুলোবালি, পাথর নীচে ফেলে দিতে লাগল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আট-দশজন দাঁড়াবার মত জায়গা হয়ে গেল। ফ্রান্সিস ঠিক বুঝল, এটাই সেই গুহা। ধুলোবালি পাথরের ধ্বস নেমে মুখটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এরপর আর সকলে নেমে এল। ধুলোবালি, পাথর সরাবার কাজ চলল পুরোদমে। সারাদিন কাজ চলল, তারপর একটু রাত হলে কাজকর্ম বন্ধ করে সবাই খেয়ে ছিল। রাত্রের মত সবাই ওখানেই জায়গা করে শুয়ে পড়ল।



সাপের শরীরটা কিছুক্ষণ ছটফট করে স্থির হয়ে গেল।

শেষ রাত্রির দিকে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও চমকে উঠল কী একটা ঠাণ্ডা জিনিস কাছির মত ওর পা'টা জড়িয়ে ধরেছে। ফ্রান্সিস পা সরিয়ে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। মশালের কাঁপা-কাঁপা আলোয় দেখল, একটা অজগর সাপ ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। ফ্রান্সিস যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেওয়ালের দিকে সরে গেল। তারপর কোমর থেকে তরোয়ালটা খুলে অজগরটার দিকে নজর রাখল। মস্ত বড় সাপটা খুব ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে। ওর লেজটা তখনও ফ্রান্সিসের দু'জন সঙ্গীর পায়ের ওপর রয়েছে। মুখ তুলে সাপটা আর একটু এগোতেই ফ্রান্সিস প্রচণ্ড বেগে অজগরটার মাথা লক্ষ্য করে তরোয়াল চালাল। তরোয়ালের আঘাতে সাপটার মাথা কেটে দূরে ছিটকে পড়ল। কাটা শরীরটা থেকে গল্‌-গল্‌ করে রক্ত বেরোতে লাগল। সাপের শরীরটা কিছুক্ষণ ছটফট করে স্থির হয়ে হয়ে গেল। ফ্রান্সিস কাউকে আর ডাকল না। সাপের দু-টুকরো শরীর আর মাথাটা তরোয়ালের ডগায় করে গুহার বাইরে ফেলে দিল। তারপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ভোরবেলা ফ্রান্সিসের সঙ্গীরা ঘুম থেকে উঠে ধুলোবালি পাথরের মধ্যের চাপ-চাপ রক্ত এল কোত্থেকে। ফ্রান্সিস তখনও ঘুমোচ্ছে। ওকে ডাকল ওরা। ফ্রান্সিস উঠে বসল। ফ্রান্সিস হেসে বললে—'কাল রাত্রিতে একটা অজগর মেরেছি। তারই রক্ত।'

সবাই ধুলোবালি-পাথর সরাবার কাজে লেগে পড়ল। হঠাৎ দেখা গেল, ধুলোবালির



দ্রুতবেগেই দু'জনের তরোয়াল চলতে লাগল।

স্তরটা শেষ হয়ে গেছে। একটা ফোকর পাওয়া গেল। বোঝা গেল, এখানেই ধুলোবালি আর ছোট-ছোট পাথরের স্তর শেষ হয়ে গেছে। সেই স্তরটা খুঁড়ে ফেলতেই গুহাটা স্পষ্ট দেখা গেল। উত্তেজনায় সবাই চেঁচিয়ে উঠল। ফ্রান্সিসও কম উত্তেজিত হয়নি। মদিনা মসজিদের গম্বুজের মত হীরেটা তখন প্রায় হাতের মুঠোয়।

গুহাটার ভিতরটা অন্ধকার। সন্তর্পণে কিছুটা এগোতেই ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, একটা বিরাট গহবর নীচের দিকে নেমে গেছে। ওকে দাঁড়িয়ে পড়তেই দেখে পিছন থেকে একজন জিজ্ঞেস করল—কী হল ফ্রান্সিস?

ফ্রান্সিস বলল—আর এগোনো যাবে না—সামনেই একটা গহবর।

সঙ্গীদের একজন জিজ্ঞেস করল—মকবুল কি তোমাকে এই গহবরের কথা বলেছিল?

—না।

—তাহ'লে?

একটু ভেবে ফ্রান্সিস বলল—মনে হচ্ছে, পাহাড়টায় ধ্বস নামার সময় হীরেটা বোধহয় এই গহবরেই পড়ে গেছে।

—এটা তো তোমার অনুমান—একজন সঙ্গী বলল।

—পরীক্ষা করলেই অনুমানটা সত্যি কিনা বোঝা যাবে।

—কী ভাবে পরীক্ষা করবে?

—আমি গহবরের মধ্যে নামব।

ফ্রান্সিসের সঙ্গীদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। তারা কেউই ফ্রান্সিসকে একা ছাড়তে রাজী নয়। তারা বলল—তোমার সঙ্গে আমরাও নামবো।

ফ্রান্সিস বলল—সে হয় না। আমাদের সবাইকে একসঙ্গে বিপদে পড়া চলবে না।

—কিন্তু তোমার একারও তো বিপদ ঘটতে পারে।

—একটা বিপদ তো কাল রাত্তিরে শেষ করেছি। বড় জোর আর একটা অজগর থাকতে পারে। ভয়ের কিছু নেই। তোমার কাছিটার একটা দিক পাথরের সঙ্গে বেঁধে দাও।

কাছিটা বাঁধা হল ফ্রান্সিস কাছিটা ধরে ঝুলে পড়ল। হাতে একটা মশাল জেবলে আস্তে-আস্তে গহবরের মধ্যে নামতে লাগল। চারিদিকে পাথরের চাঁই, তারই মধ্যে দিয়ে গহবরটা সুড়ঙ্গের মত নেমে গেছে।

বেশ কিছুটা নামবার পর পায়ের নীচে একটা পাথরের মতো কি যেন ঠেকল। জিনিসটার গা এবড়োখেবড়ো। ওটার ওপর দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস মশালটা নীচে নামিয়ে আনল। আশ্চর্য! সেই অমসৃণ জিনিসটায় মশালের আলো পড়তে আলো ঠিকরে পড়ল। তাহ'লে এটাই মকবুলের হীরে। ফ্রান্সিস মশালটা এদিক-ওদিক ঘোরালো। ঠিকরে পড়া আলোর দ্যুতিও অন্ধকারে এদিক-ওদিক নড়তে লাগল। ফ্রান্সিস আনন্দে চীৎকার করে উঠল। সমস্ত গহবরটা সেই চীৎকারে প্রতিধ্বনিত হল। গহবরের মুখে দাঁড়ানো ফ্রান্সিসের বন্ধুরা চীৎকার করে সাড়া দিল।

এবার আসল কাজ। ফ্রান্সিস হীরেটার ওপর বসে একটু জিরিয়ে নিল। তারপর কাছিটা দিয়ে হীরেটাকে চারদিক থেকে বাঁধল। এই বাঁধার সময় ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল

গহ্বরটা এখানেই শেষ হয়নি। হীরেটা আটকে আছে খাঁজের মত জায়গায়। তার পাশেই গহ্বরটা নেমে গেছে আরো নীচে। মশাল ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আন্দাজ করে দেখল মকবুল যত বড় হীরের কথা বলেছিল, এই হীরেটা ততো বড় নয়। তখনই ফ্রান্সিসের মনে হলো পাহাড়ের ধ্বস নামার সময় নিশ্চয়ই হীরেটা দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল। একটা টুকরো এখানকার খাঁজে আটকে আছে, অন্যটা এই গহ্বরের আরো নীচে পড়ে আছে। গহ্বরের জমাট অন্ধকারে নীচে আর কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না।

হীরেটা ভালো করে বেঁধে ফ্রান্সিস কাছি ধরে-ধরে ওপরে উঠতে লাগল। একসময় গহ্বরের মুখে এসে উঠে দাঁড়াল। আনন্দে উত্তেজনায় ফ্রান্সিস তখন কথা বলতে পারছে না। বন্ধুদের সুসংবাদটা দেবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে গেল, তখনই পিঠে কে যেন তরোয়ালের ডগা চেপে দাঁতচাপা স্বরে বলল, চুপ করে দাঁড়ান আপনাদের বন্ধুদের মত।

ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে ঘুরে দাঁড়ালো। দেখল, ওর পিঠে তরোয়াল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুর্গাধক্ষ্য হেনরী। তার সঙ্গে একদল সৈন্য। ফ্রান্সিস অবাক হয়ে গেল। দেখল ওদের বন্ধুদের সব গুহার একপাশে আটকে রাখা হয়েছে। তাদের তরোয়াল কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দু'একজনকে আহতও মনে হল। হেনরী ঠাট্টার সুরে বলল—এখানে নিশ্চয়ই কার্পেট বিক্রী করতে আসেননি ?

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না।

—বোধহয় ভাবছেন আমরা এখানে এলাম কি করে ? খুবই সোজা উত্তর। আপনারাই পথ দেখিয়ে এনেছেন।

—আমরা ? ফ্রান্সিস বিস্ময় সুরে বলল।

—হ্যাঁ—আপনাদের গাইডকে বলাই ছিল, সে যেন পথে চিহ্ন রেখে আসে—ও তাই করেছিল—সুতরাং আপনাদের খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হয় নি।

ফ্রান্সিস এবার বুঝল, কেন গাইডটি গাছের ডাল কেটে রাখত—মাটিতে দা, দিয়ে হিজিবিজি দাগ কাটত। ফ্রান্সিস বেশ কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করল—আমাদের পিছু ধাওয়া করার মানে কি ?

আপনাদের যাওয়ার কথা ছিল ওঙ্গালির বাজারে—কিন্তু এখানে এলেন কেন ?

— আমরা যেখানে খুশী যেতে পারি।

—তা পারবেন। কিন্তু এত কষ্ট করে এখানে আসার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। কিছুক্ষণ আগে আপনি গহ্বর থেকে আনন্দে চীৎকার করে উঠেছিলেন। আপনার বন্ধুরাও তাতে সাড়া দিয়েছিল। আমরা তখন গুহার মুখে আড়ালে দাঁড়িয়েছিলাম। আপনার এত আনন্দিত হওয়ার কারণটা জিজ্ঞেস করতে পারি কি ?

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। কোন কথা বলল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে হেনরী বলল—তাহ'লে কাছিটা তুলে দেখতে হয়, আপনাদের এত আনন্দের কারণটা কি ?

—বেশ দেখুন, ফ্রান্সিস বলল।

হেনরী তার সৈন্যদের হুকুম দিল কাছিটা ধরে টেনে তুলতে।

ফ্রান্সিসদের বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—আপনারাও একটু সাহায্য করুন। সকলে মিলে কাছিটা টানতে লাগল। আস্তে-আস্তে কাছি-বাঁধা হীরেটা উঠে আসতে লাগল।

যখন গুহার ওপর এনে হীরেটা রাখা হল, তখন হেনরী হেসে বলল—এই পাথরটার জন্যে আপনাদের এত উল্লাস ?

জিনিসটা সামান্য নয়—ফ্রান্সিস শান্ত স্বরে বলল—এটা একটা হীরের খণ্ড।

—বলেন কি ! হেনরীর চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

ধ্বস নামার আগে এই পাহাড়ের এই গুহার মুখেই আলোর বিচিত্র খেলা দেখা যেত।

—হ্যাঁ, শুনেছি একটা পাহাড় আছে, লোকে বলে মায়াপাহাড়।

—এই পাহাড়ই সেই মায়াপাহাড়। আর গুহার মুখেই আলোর বর্ণচ্ছটা দেখা যেত।

বিস্ময়ে হেনরীর চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। সে হীরেটার কাছে ছুটে গেল। হীরের অমসৃণ গায়ে হাত বুলোতে লাগল। কিন্তু তার মানে সন্দেহ থেকেই যায়। সে বলল—আপনি কি করে জানলেন এটা হীরে ?

—মকবুলের কাছ থেকে।

—মকবুল কে ?

—আমার বন্ধু। আগেরবার যাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু সে আমার সঙ্গে আর ফিরতে পারে নি। হিংস্র মোরানদের হাতে মারা গেছে।

—ও। কিন্তু এটা কি সত্যিই হীরের খণ্ড ? হেনরীর সন্দেহ তবু যেতে চায় না।

—গুহার মুখে হীরেটা নিয়ে আসুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন।

—বেশ। হেনরী তার সৈন্যদের ইঙ্গিত করল। তারা সবাই কাছিটা ধরে টেনে হীরের গুহার মুখের কাছে নিয়ে এল। যেটুকু সূর্যের আলো তেরচা হয়ে পড়ল, তাতেই হীরেটা জ্বলজ্বল করে উঠল। বিচিত্র রঙের ছটা বেরোতে লাগল হীরেটার গা থেকে। হেনরী চোখ দু'টো লোভে চকচক করে উঠল। সে সঙ্গে-সঙ্গে তার সৈন্যদের হুকুম দিল—কাছিটা ধরে আস্তে-আস্তে হীরেটা পাহাড়ের নীচে নামিয়ে দাও।

ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি হাত তুলে সৈন্যদের ইঙ্গিত করে হেনরীর কাছে এগিয়ে এসে বলল—এই হীরেটা কি আপনি নিয়ে যেতে চান ?

—অবশ্যই—হেনরী হাসল—নইলে এত কষ্ট করে আপনাদের পিছু এলাম কেন ?

ফ্রান্সিস গম্ভীর স্বরে বলল—দেখুন, আপনারা একদিন আমার প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই আপনাকে আমি সব কথা বলেছি, কিছুই গোপন করি নি। আমি যদি না বলতাম, তাহ'লে একটা এবড়োখেবড়ো পাথরের খণ্ড ভেবে আপনারা চলে যেতেন।

—তা কি বলা যায়। সমুদ্র পেরিয়ে এতদূর থেকে আপনারা এসেছেন কার্পেট বিক্রী করতে, তাও সঙ্গে আপনাদের কার্পেট নেই। একটা গাড়ী এনেছেন, তার আবার মাথা খোলা। এই সবকিছুই আমার মনে সন্দেহের উদ্বেগ উঠেছিল। যে পাথরটা আপনারা তোলার আয়োজন করেছিলেন, সেটা দামী কিছু, এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সেটা যে একটা আস্ত হীরে, এটা আমার কল্পনারও বাইরে ছিল।

—তাহ'লে আর একটা কথা আপনাকে জানাই। এই হীরেটা একটা খণ্ডমাত্র।

—বলেন কি ?

—হ্যাঁ, এটা আমার অনুমান। পাহাড়ে যখন ধ্বস নেমেছিল, তখন আস্ত হীরেটা

দু'খণ্ড হয়ে যে গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে পড়ে যায়। এই খণ্ডটা আমি পেয়েছি গহ্বরটার একটা খাঁজে। অন্য খণ্ডটা গহ্বরের তলদেশে কোথাও পড়েছে।

—তাই নাকি। হেনরী খুশীতে লাফিয়ে উঠল।

—আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। ফ্রান্সিস গম্ভীরস্বরে বলল—সেই অন্য হীরের খণ্ডটার জন্যে আমি আবার গহ্বরে নামব। যদি সেই খণ্ডটা পাই, তাহ'লে আপনারা এটা নিয়ে যাবেন, আমাদের কোন আপত্তি নেই।

—আপত্তি থাকলেই বা শুনছে কে?

—তাহ'লে লড়ে নিতে হবে।

হেনরী হো-হো করে হেসে উঠল—একমাত্র আপনার কোমরেই তরোয়াল আছে—ওটা আর নিইনি। আপনার দলের বাদবাকী সকলের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং গুহার মুখ থেকে নীচে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এর পরেও লড়তে চান?

—হ্যাঁ, আমি একাই লড়বো।

—কেন মিছিমিছি বেঘোরে প্রাণটা দেবেন।

ফ্রান্সিস তরোয়ালের হাতলে হাত রাখল। হেনরী তাই দেখে বলে উঠল—উঁহু, উঁহু—খুন-খারাপি আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। তার চেয়ে আমাদের একজন লোক গহ্বরে নামুক। খোঁজ করে দেখুক, আর একটা হীরের খণ্ড পায় কিনা।

—আগে বলুন সেটা পেলে কে নেবে?

—বেশ। আর একটা হীরের খণ্ড পেলে আপনারা নেবেন।

—খুব ভালো কথা।

হেনরীর ইশারায় সৈন্যদল থেকে একজন এগিয়ে এল। আবার গহ্বরের মধ্যে কাছি ফেলা হল। লোকটি কাছি ধরে নামতে লাগল। এক হাতে মশাল ধরে লোকটি অনেকটা নেমে গেল। একটু পরেই হঠাৎ লোকটির আর্তনাদ শোনা গেল। সেই আর্তনাদ গহ্বরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সবাই ছুটে গহ্বরের কাছে গেল। কাছি টেনে দেখা গেল, লোকটা কাছি ছেড়ে গহ্বরের নীচে পড়ে গেছে। কি কারণে এমনটা হলো, কেউই ভেবে পেল না। হেনরী কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। চোখের সামনে এরকম মৃত্যু দেখে কেউই আর গহ্বরে নামতে সাহস পেল না।

এবার ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসের বন্ধুরা তাকে নানাভাবে নিবৃত্ত করতে চাইল। কিন্তু পারল না। ফ্রান্সিস বলল, আমার জন্যে কাউকে ভাবতে হবে না। আমি এখন যা বলি মন দিয়ে শোন। যারা কাছি ধরে ছিল তাদের বলল—আমি কাছি ধরে দুবার ঝাঁকুনি দিলেই কাছি ছাড়তে থাকবে, যতক্ষণ না আমি গহ্বরের একেবারে শেষে নেমে কাছিটায় আবার দু'টো ঝাঁকুনি না দিই। যদি হীরের খণ্ডটা পাই, তাহ'লে সেটাকে কাছি দিয়ে বেঁধে কাছিটাতে আবার দু'টো ঝাঁকুনি দেব। তখন তোমরা কাছি টেনে তুলবে।

ফ্রান্সিস এক হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে কাছি বেয়ে নীচে নামতে লাগল। কিছুদূর নামতেই সেই গহ্বরের খাঁজটার কাছে এল। মশালের আলো পড়তে দেখল দু'টো বিষধর সাপ সেই খাঁজটায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবার ফ্রান্সিস বুঝতে পারল। আগের লোকটা নিশ্চয়ই বিশ্রাম নিতে এখানে দাঁড়িয়েছিল। তখনই সাপ কামড়েছে। আর লোকটাও এই

অতর্কিত আক্রমণে হকচকিয়ে নীচে পড়ে গেছে। ফ্রান্সিস হাতের মশালটা সেই খাঁজের ধুলোবালির মধ্যে পুঁতে দিল। এবার সাপ দুটোকে স্পষ্ট দেখা গেল। ফ্রান্সিস পা দুটো দিয়ে কাছিটা জড়িয়ে ধরল। কোমরে থেকে তরোয়াল খুলল। তারপর একটা সাপের মাথার দিকে লক্ষ্য রেখে সজোরে তরোয়াল চালাল, সেই সাপের মাথাটা কেটে ছিটকে পড়ল। সাপের শরীরটা বারকয়েক নড়ে উঠল। তারপর আর নড়ল না। এবার আর একটা সাপ। সেই সাপটা কিন্তু বিপদ বুঝে পাহাড়ের ফাটলটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। আর সাপটাকে দেখা গেল না। ফ্রান্সিস আবার কাছিটাতে দু'বার ঝাঁকুনি দিল, ওপর থেকে যারা কাছি ধরেছিল, তারা কাছি ছাড়তে লাগল। ফ্রান্সিস মশালটা ধুলোবালি থেকে তুলে নিয়ে আবার নামতে লাগল।



সাপের মাথাটা কেটে ছিটকে পড়ল।

বেশ কিছুটা নামবার পর দেখল, নীচে যেখানে গহ্বরটা শেষ হয়ে গেছে, সেখানে লোকটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। ওর হাতের মশালটা একপাশে পড়ে গিয়ে তখনও জ্বলছে। সেই মশালের আলো যে এবড়ো-খেবড়ো পাথরটায় পড়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, আর সেটা যে আর একখণ্ড হীরে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। ফ্রান্সিস নামতে-নামতে হীরেটার ওপর এসে দাঁড়াল। তারপর লোকটার মৃতদেহ একপাশে সরিয়ে কাছি টেনে-টেনে হীরেটা বাঁধল। বাঁধা হলে কাছিটায় ধরে দুটো ঝাঁকুনি দিল। গহ্বরের ওপর থেকে সবাই আস্তে-আস্তে হীরেটা ওপরে উঠতে লাগল। সেই সঙ্গে ফ্রান্সিসও উঠতে লাগল।

গহ্বরের মুখে আসতেই ফ্রান্সিস নেমে এল। তারপর সবাই মিলে টানতে-টানতে হীরেটাকে গুহার মধ্যে নিয়ে এল।

হীরের আর একটা খণ্ড দেখে হেনরীর আনন্দ দেখে কে! সে একবার একখণ্ড হীরের কাছে যায়, আর পরক্ষণেই অন্য হীরেটার কাছে যায়। ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে দৃঢ় পদক্ষেপে হেনরীর কাছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল—তাহ'লে আপনি কি স্থির করলেন?

—কোন ব্যাপারে?

—একটা হীরের খণ্ড আমরা নেব, আর একটা আপনারা নেবেন।

—অসম্ভব!

—তার মানে?

—জানেন, এত বড় দুই খণ্ড হীরে যদি পর্তুগালে নিয়ে গিয়ে রাজাকে দিতে পারি—রাজসভায় আমার সম্মান কত বেড়ে যাবে।

—কিন্তু কথা ছিল—একখণ্ড হীরে আমরা নেব।

—তেমন কোন কথা হয়েছে বলে তো আমার মনে পড়ছে না।

—তাহ'লে আপনি কি রক্তক্ষয় চান?

হেনরী ফ্রান্সিসের কথা কানেই নিল না। নিজের সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল—হাঁ করে দেখছ কি। হীরে দু'টো নীচে নামাও।

সৈন্যরা তাড়াতাড়ি কাছি দিয়ে বাঁধা হীরের খণ্ডটা টানতে-টানতে গুহার মুখের কাছে নিয়ে এল। তারপর ধরে-ধরে আস্তে-আস্তে নীচে নামিয়ে দিতে লাগল।

ফ্রান্সিস শক্ত চোখে একবার হেনরীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিল। তারপর তরোয়ালের হাতলে হাত রাখল। বন্ধুরা সব ছুটে এসে ওর হাত চেপে ধরল, বললো—ফ্রান্সিস, এমন পাগলামি করো না।

ফ্রান্সিস অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলে উঠল—যে হীরের জন্যে আমার দু'জন বন্ধু প্রাণ দিয়েছে, সেটা আমি এভাবে হাতছাড়া হতে দেব না।

বন্ধুরা কোন কথা শুনল না। বারবার ফ্রান্সিসকে শান্ত হতে অনুরোধ করতে লাগল। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে কি যেন ভাবল। তারপর তরোয়ালের হাতল থেকে হাত সরাল।

দ্বিতীয় হীরের খণ্ডটাও ততক্ষণে নামানো শুরু হয়েছে। আস্তে-আস্তে ওটাও নামানো হল। এবার সকলের নামবার পালা, প্রথমেই নেমে গেল হেনরী, তারপর তার সৈন্যরা।

এবার নামল ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুরা। নীচে নেমে ফ্রান্সিস দেখল, ওদের গাড়িতে একখণ্ড হীরে তোলা রয়েছে। হেনরীও একটা গাড়ি নিয়ে এসেছে। সেটাতে হীরের অন্য খণ্ডটা তোলবার তোড়জোড় চলছে। সৈন্যরা সবাই মিলে ধরাধরি করে হীরেটা হেনরীর গাড়িতে তুলল।

বেলা পড়ে এল। সন্ধ্যে হতে আর বেশী দেরী নেই। ফ্রান্সিসদের তো আর কিছু করবার নেই! তারা সে রাতটা এখানেই কাটিয়ে যাবে স্থির করল। হেনরীও তার সৈন্যদের নিয়ে রাত্রিবাসের জন্য বন্দোবস্ত করতে লাগল।

* * *

রাত গভীর হল। সারাদিন খাটুনির পর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম নেই শুধু ফ্রান্সিসের চোখে আর হেনরীর দুই প্রহরারত সৈন্যের চোখে। ওরা দু'জন খোলা তরোয়াল হাতে হীরে দু'টো পাহারা দিচ্ছে।

ফ্রান্সিস শুয়ে ছটফট করতে লাগল। কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না এখন কি করবে। শুধু সুযোগের আশায় বসে থাকা ছাড়া কিছুই করবার নেই। অথচ সময় নেই। একবার যদি হীরে দু'টো নিয়ে হেনরী দুর্গে ঢুকতে পারে, তাহ'লে হীরে দু'টো আর ফিরে পাওয়া অসম্ভব। ফ্রান্সিস এক-একবার উঠে মশালের আলো দেখছে হেনরীর সৈন্যরা আর তার বন্ধুরা সবাই অকাতরে ঘুমুচ্ছে। ওর কিন্তু ঘুম আসছে না। চুপচাপ শুয়ে আছে ও।



তখনই শুনল-ফ্রান্সিস-আমি হ্যারি-

হঠাৎ দেখল, অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে-মেরে কে যেন এদিকেই আসছে। ফ্রান্সিস ঘুমের ভান করে শুয়ে-শুয়ে লোকটাকে দেখতে লাগল। লোকটা কাছাকাছি আসতে দেখল—লোকটার খালি গা, পরনে শুধু একটা নেংটি। মুখে গায়ে উল্কি আঁকা। ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠল—মোরান উপজাতির লোক। ফ্রান্সিস শিয়র থেকে তরোয়ালটা টেনে নিয়ে এক লাফে উঠে দাঁড়াল। লোকটা প্রথমে হকচকিয়ে গেল তারপরই ছুটে এসে ফ্রান্সিসের তরোয়ালসুদ্ধ হাতটা চেপে ধরল। ফ্রান্সিস হাতটা ছাড়াবার জন্যে লোকটাকে ধাক্কা দিতে যাবে তখনই শুনল—ফ্রান্সিস—আমি হ্যারি।



ফ্রান্সিসের তরোয়ালসুদ্ধ হাতটা চেপে ধরল।

ফ্রান্সিস প্রায় লাফিয়ে উঠল—হ্যারি, তুমি এখনও বেঁচে আছ!

হ্যারি আস্তে বলল—এইটুকু কুশব্দ করো না। পরে সব বলবো।

ফ্রান্সিসের আনন্দে তবু বাধা মানছে না। হ্যারির হাত চেপে ধরল।

হ্যারি চুপিচুপি বলল—এখন আমাদের অনেক কাজ। মন দিয়ে শোন, তোমাকে কি করতে হবে।

—বলো।

—সব বন্ধুদেরও জাগাও। পাহারাদার সৈন্য দু'টোকে কাবু করে সবাই যেন গাড়ি দু'টোয় উঠে বসে। তারপর ঘোড়াগুলোকে এনে গাড়িতে জুড়তে হবে। কোনরকম শব্দ যেন না হয়। কিন্তু সমস্যা হল গাড়ি চলাবে কে?

—রিঙ্গো একটা গাড়ি চালাবে, অন্যটা আমি চালাবো।

—তুমি পারবে তো?

—হ্যাঁ—আমি অনেকদিন চালিয়ে-চালিয়ে অভ্যেস করেছি।

—বেশ। এবার পরের কাজ। সমস্ত জায়গাটা মোরান উপ-জাতিরা ঘিরে ফেলেছে। আমি একটা সংকেত দিলেই ওরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তবে মোরানদের বলা আছে তারা যুদ্ধ করবে না—শুধু এদের আটকে রাখবে।

—বলো কি!

—হ্যাঁ। আমি খড়কুটো তীরের ডগায় আটকে আগুন জ্বালিয়ে চারদিকে ছুঁড়ে মারব। ঠিক তখনই ওরা চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে। আগুনের তীর ছুঁড়েই আমি লাফিয়ে তোমার গাড়িতে উঠবো। তারপর আর কিছু করবার নেই। যত দ্রুত সম্ভব গাড়ি চালিয়ে আমাদের পালাতে হবে। বুঝেছ?

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকাল। তারপর গুঁড়ি মেরে তার বন্ধুদের কাছে-কাছে গিয়ে একে-

একে সবাইকে জাগাল। ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে সবাইকে চুপ করে থাকতে নির্দেশ দিল। তারপর রিঙ্গোকে সঙ্গে নিয়ে গুঁড়ি মেরে-মেরে চলল পাহারাদার দু'টির উদ্দেশ্যে। হঠাৎ পিছন থেকে লাফ দিয়ে মুহূর্তে পাহারাদার দু'টিকে কাবু করে ফেলল ওরা। দু'টো পাহারাদারের মুখে রুমাল গুঁজে হাত-পা দাড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখল। তারপর ঘোড়াগুলোকে আস্তে-আস্তে এনে গাড়ি দু'টোতে জুতল। চাপা স্বরে সবাইকে ডাকল গাড়িতে ওঠার জন্যে। সবাই দু' ভাগ হয়ে সন্তর্পণে গাড়ি দু'টোতে উঠে বসল।

এবার হ্যারি খড়কুটো বাঁধা তীরগুলো মশাল থেকে আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে চারদিকে ছুঁড়ে মারতে লাগল। সবক'টা তীর ছুঁড়েই হ্যারি এক লাফে গাড়িতে উঠে বসল। ফ্রান্সিস আর রিঙ্গো গাড়ি ছেড়ে দিল। আর ঠিক তখনই শোনা গেল চারদিকে মোরানদের চীৎকার। বনের চারদিকে আগুন ধরে গেছে। তারই মধ্য দিয়ে ফ্রান্সিসরা জোরে-জোরে চালিয়ে গাড়ি দু'টোকে বের করে নিয়ে এল। তারপর গাড়ি দু'টো বেগে ছুটল। ফ্রান্সিস পেছনে তাকিয়ে দেখল সমস্ত বনটায় আগুন লেগে গেছে। হেনরীর সৈন্যরা যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে।

সারাদিনে মাত্র একবার দুপুরবেলায় গাড়ি থামিয়ে একটা ঝরণার ধারে বসে খেয়ে নিল সবাই। তারপর আবার গাড়ি ছুটল। হেনরী যে গাড়িটায় এসেছিল, তার মধ্যে হীরের খণ্ডটা আটেনি। তাই কাছি দিয়ে গাড়িটার সঙ্গে বাধা হয়েছিল। গাড়ি চলার ঝাঁকুনিতে কাছিটা আলগা হয়ে গিয়েছিল। সেটার আবার নতুন করে বাঁধা হলো। আবার ছুটল গাড়ি। সন্ধ্যার সময় গাড়ি থামানো হল। রাতটা কাটল উন্মুক্ত আকাশের নীচে। তাঁবু ফেলে আসতে হয়েছে। ফ্রান্সিস বুদ্ধি করে খাবারের বাক্সটা তুলে নিয়েছিল, তাই যাহোক কিছু খাবার জুটল। রাত্রে বিশ্রাম নিয়ে আবার ভোর হতেই গাড়ি ছুটল।

হ্যারি ফ্রান্সিসের পাশে এসে বসল। । ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করলো—হ্যারি এবার বলতো, তুমি কি করে বাঁচলে?

হ্যারি বলতে লাগল—তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, পায়ে তীর লাগার পর একটা পাথরের ঢিবি থেকে আমি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ, মনে আছে।

—যে পাথরের ঢিবির নীচে আমি পড়ে গিয়েছিলাম, সেই পাথরটাকে মোরানরা দেবতা জ্ঞানে পুজো করত। পাথরটাতে রঙ-বেরঙের দাগ, নীচে পুজোর ফুল এসব ছিল। আমরা কেউ কিন্তু সে-সব লক্ষ্য করি নি। আমাদের অনুসরণকারী যে লোকটা আমাকে দেখে উল্লাসে চীৎকার করে উঠেছিল। আমাকে মারবার জন্যে দা উঁচিয়ে এগিয়ে এল। কিন্তু পাথরের ঢিবিটার দিকে হঠাৎ নজর পড়তেই দাঁড়িয়ে পড়ল। এমনিতেই মোরানরা ধর্মভীরু। তার ওপর যে পাথরটাকে ওরা পুজো করে, তারই নীচে আমি পড়ে আছি—এসব দেখে-শুনে লোকটার মুখ শুকিয়ে গেল। সে দা'টা কোমরে গুঁজে আমার কাছে এল। পা দিয়ে তখন গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। লোকটা আমাকে পাঁজাকোলা করে গালকাটা সর্দারের কাছে নিয়ে এল। সর্দার সব কথা শুনে ওদের এক সঙ্গীকে ইঙ্গিত করল। সে বনের মধ্যে ঢুকে গেল। একটু পরেই কিছু লতাপাতা নিয়ে বন থেকে বেরিয়ে এল। সেই লতাপাতা দিয়ে আমার পা'টা বেঁধে দিল। অনেকটা আরামবোধ

করলাম। তারপর সর্দারের দু'জন সঙ্গী কাঁধ ধরে-ধরে এগোলাম ওদের গ্রামের দিকে। সেখানে একটা বাড়িতে রেখে ওরা চলে এল।

—তারপর ?

—আমার চিকিৎসা আর সেবা-শুশ্রূষা করল। কিছুদিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। তবে এখনও একটু খুঁড়িয়ে চলতে হয়। হোক, আমার সঙ্গে মোরানরা ভালো ব্যবহার করতে লাগল। আসলে ওরা ধরে নিয়েছিল, আমি ওদের দেবতা প্রেরিত মানুষ। আস্তে-আস্তে আমি ওদের পরামর্শদাতা হয়ে গেলাম। আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে মোরান-সর্দার কোন কাজই করত না।

—হ্যারি, তুমি আমাদের খোঁজ পেলে কী করে ?

—ওঙ্গালির বাজার থেকে মাইল পনেরো উত্তরে হীরের পাহাড়; এটা আমি জানতাম। আমি সেইজন্যে সেই পাহাড়টার কাছে একজন মোরানকে পাহারায় রেখেছিলাম। আমি জানতাম, তুমি আসবেই। তোমরা যখন এলে তারপর থেকে সমস্ত ঘটনাই আমরা দেখেছি। দুর্গরক্ষক লোকটা যে কিছুতেই হীরে দু'টো হাতছাড়া করবে না, এটা বুঝেছিলাম। আমি তখনই দুর্গরক্ষক আর তার সৈন্যদলকে নিঃশেষ করতে পারতাম। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম বিনা রক্তক্ষয়ে কার্যোদ্ধার করতে। শুধু পালাবার সুযোগ করে নেওয়া। মোরানদের নির্দেশ দিয়েছিলাম, আমি আগুনের তীর ছোঁড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তারা যেন চীৎকার হইহুল্লো করে দুর্গরক্ষক আর তার সৈন্যদের ঘাবড়ে দেয়। এই সুযোগটা পেলে গাড়ি নিয়ে আমরা পালাতে পারবো। হলোও তাই।

—কিন্তু তুমি আমাদের সঙ্গে পালাবে এটা মোরানরা জানে ?

—না, ওরা জানে আমি আবার ওদের কাছে ফিরে আসবো। তাই চারিদিকে আগুন লাগাবার সংকেত দিয়েছিলাম। আগুন নিয়ে ওরা এত ব্যস্ত থাকবে যে, আমার পালানোটা ওরা লক্ষ্য করতে পারবে না।

—হ্যারি তুমি বেঁচে আছো, দেখে এত খুশী হয়েছি যে—কি বলবো আমি। আবেগে ফ্রান্সিসের গলা বুঁজে এল।

ফ্রান্সিস ওসব আর ভেবো না। হ্যারি ফ্রান্সিসের কাঁধে হাত রাখল। বলল—তোমরা নিশ্চয়ই জাহাজ নিয়ে এসেছো।

—হ্যাঁ, তেকরুর বন্দরে জাহাজ রয়েছে।

—তাহ'লে এখন আমাদের একটা কাজ—যে করেই হোক হীরে দু'টো জাহাজে তোলা।

গাড়ি ছুটে চলল। ফ্রান্সিস আর রিঙ্গো দু'জনেই যথাসাধ্য দ্রুত গাড়ি চালাবার চেষ্টা করছে। দিগন্তবিস্তৃত মেঠো জমিতে পড়ে রাত্তিরেও গাড়ি চালাতে লাগল। গাইডটির নির্দেশে চলে ওরা পথটা আরো সংক্ষিপ্ত করে নিল। এই সংক্ষিপ্ত পথে নাকি সিংহের ভয় আছে। কিন্তু কপাল ভাল বলতে হবে—সামনা-সামনি কোন সিংহ পড়েনি।

* * *

দু'দিন পরে এক সন্ধ্যায় ওরা তেকরুর বন্দরে এসে পোঁছল। সঙ্গের গাইডটিকে এবার বিদায় দিল ওরা। ওকে পুঁতির মালা, আয়না, চিরুনি দিল, গাইডটা খুশী হল।

ফ্রান্সিসের জাহাজের বন্ধুরা হইহই করে উঠল। অবাক্ চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল হীরের খণ্ড দুটি। তারপরেই আনন্দে কেউ-কেউ হেঁড়ে গলার গান ধরল—নাচতে লাগল কেউ-কেউ। ফ্রান্সিস গাড়িতে দাঁড়িয়ে সবাইকে ডেকে বলল—ভাইসব, এখনও নিশ্চিন্ত হবার সময় আসেনি। আনন্দ করার সময় পরে অনেক পাবে। এখন হীরে দু'টো জাহাজে তোলার জন্যে সবাই হাত লাগাও।

হীরে দু'টো গাড়ি থেকে নামাতে রাত হয়ে গেল। চারদিক মশাল পুঁতে তারই আলোতে কাজ চললো। এবার হীরে দু'টো জাহাজে তোলার জন্য সবাই কাঁধ লাগালো। জাহাজে ওঠার পাঠাতনে সাবধানে পা ফেলে একটা হীরের খণ্ড জাহাজে তোলা হল। দুর্ঘটনা কিছু ঘটল না। তবে একজন পা পিছলে সমুদ্রের জলে পড়ে গেল। জাহাজ থেকে দড়ি ফেলা হল। লোকটি নিজেই দড়ি বেয়ে জাহাজে উঠে এল। ফ্রান্সিস সবাইকে ডেকে বলল—আমাদের এক্ষুনি জাহাজ ছেড়ে দিতে হবে। এখানে এক মুহূর্তও আর দেরী করবো না আমরা।

ঘড়ঘড় শব্দে নোঙর তোলা হলো। পাল খাটানো হলো। হাওয়া লাগতেই পালগুলো, ফুলে উঠল। জাহাজ চললো গভীর সমুদ্রের দিকে।

জাহাজে তক্ষণে মশাল হাতে নাচ শুরু হয়ে গেছে। গান গাওয়া চলল সেই সঙ্গে। সবাই জুটলো সেখানে হীরের খণ্ড দু'টোর চারপাশে ঘুরে-ঘুরে সবাই নাচতে লাগল। শুধু ফ্রান্সিস একা ডেকে-এ দাঁড়িয়ে তেকরুর বন্দরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বারবার মকবুলের কথা মনে পড়তে লাগল। চোখ ঝাপসা হয়ে এল বারবার। তেকরুর বন্দরের আলো আস্তে-আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল। চোখ মুছে তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

॥ শেষ ॥

এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী অধ্যায়—সোনার ঘণ্টা ১০্

এই গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়—মুক্তোর সমুদ্র ১০্ তুষারে গুপ্তধন ১০্ রূপোর নদী ১০্